শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাপুরুষ


















কাপুরুষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সে যখন ছোট্ট শিশু, কত প্রশ্নই না বিমূঢ় করে তুলত তাকে।
কেন অবিচার, কেন এত
দুঃখ কষ্ট-কান্না, কোন্ কাজ
পাপ—এমন কত-কী।
বড় হয়ে সে যখন বিশ্বরূপ সেন,
দায়িত্ববান এক পুলিশ অফিসার,
তখনও যেন ঘোচে না তার বিমূঢ়তা।
থেকে-থেকেই এক চাপা ক্লান্তি, এক
প্রগাঢ় বিষাদ। প্রশ্ন ও সংশয়।
কেন?
অথচ বিশ্বরূপ অকুতোভয়।
জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য তার।
অপারেশন সুরিন্দর-এর নায়ক। সেই
সুরিন্দর, যার কাছে সব সময় এ. কে.
ফর্টিসেভেন-এর মতো সফিস্টিকেটেড
অস্ত্র, সেই ভয়ংকর উগ্রবাদী নেতা,
সপরিবার এক সাংসদকে খুন করে যে
পলাতক। তবে?
অথচ বিশ্বরূপ দীর্ঘকায়, সুপুরুষ।
নিজের কাপুরুষ স্বামীর পাশে মনে
মনে তাকে দাঁড় করায় বকুল, তাকায়
বীর-পূজারীর চোখে। সন্ত্রাসবাদীদের
সঙ্গিনী বন্দনার কাছে সে 'মিস্টার
সেক্স-অ্যাপিল'। তা হলে?
এই সময়ের পটভূমিকায় তীব্র গতি ও
অনন্যস্বাদ এক উপন্যাস 'কাপুরুষ'।
এই হানাহানির সাম্প্রতিক কুরুক্ষেত্রে
এক নতুন অর্জুনের গভীর, গূঢ়
কাহিনী।

ওই চলেছে দুঃখী দেবীলাল তার পুঁটুলিটি কাঁধে নিয়ে । ওই পুঁটুলির ভিতরে আছে কাঠকয়লার উনুন, চিমটে, ছোট্ট বড় বাটালি, সিসের ডেলা । কে আর রোজ রোজ বাসনকোসন ঝালাই করায় বাবা ? সারাদিনে কয়েকটা পয়সা মাত্র আয় । দেবীলাল চলেছে মাঠের ভিতর দিয়ে । ওই মাঠে এখন অজস্র প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে । এ যেন প্রজাপতির মরশুম । দেবীলাল না মাড়িয়ে দেয় প্রজাপতির ফিনফিনে পাখনা ।

কি করে যে মনের কথা টের পেল দেবীলাল কে জানে । মুখটা ফিরিয়ে বলল, আমি কখনও কারও ক্ষতি করিনি, বুঝলে খোকা ! তবু ভগবান দিলেন না ।

ভগবান কত কি দেন না । আবার কত কি দেনও । সে তো রোজ শোনে, তারা বড় গরিব । বড়ই গরিব । তবু ভগবান তাকে কত কি দেন আকাশ-ভরা সোনার আলো, আকাশ-ভরা তারা, চারদিকে কত দূর দূর ছড়ানো দিগন্ত, মাঠ-ভরা প্রজাপতি, গাছে পাকা কামরাঙা, লাল ঘুড়ি, ভুলোর মতো বাঘের কুকুর । ভগবান না দিলে কি সে পেত তার অত ভাল মাকে !

দুঃখী দেবীলাল একটু কোলকুঁজো হয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে । প্রজাপতি ঘিরে ধরেছে তাকে । দেবীলাল দেখছে না, মানুষ কত কি দেখে না ! জ্যোৎস্নার রাতে যখন এই মাঠে পরীরা নেমে আসে তখন কেউ দেখতে পায় না । যখন অন্ধকার রাতে হলধর ভূত আর জলধর ভূতে এখানে লড়াই হয় তখনও কেউ দেখতে পায় না । কিন্তু যখন কাদুয়া চোরকে মাঝে মাঝে বেঁধে এনে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয় তখন কত লোক দেখতে আসে সেই অমানুষিক মার চোখ চেয়ে দেখতে পারে না সে, কিন্তু কত মানুষ হেসে হররা করে । মারের পরও কাদুয়াকে সারাদিন গোলপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় । খাবার পায় না, জল পায় না । কিন্তু সন্ধেবেলা ঠিক দেখা যায়, সে পটলের দোকানের বেঞ্চে বসে দিব্যি বিড়ি ফুঁকছে ।

সে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কাদুয়াদা, তোমার লাগে না ?

কাদুয়া ঝা বাবুদের মোষের জন্য হাঁসুয়া দিয়ে ঘাস কাটছিল। বলল, লাগে। তবে কি না আমার হল টাইট শরীর।

টাইট শরীর কাকে বলে তা অবশ্য স্পষ্টভাবে জানে না সে। তবে তার খুব ইচ্ছে করে সে যখন বড় হবে তখন তার শরীরটাও যেন টাইট হয়।

লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটি বেয়ে বেয়ে একটা কালো পিঁপড়ে কেন খামোখা উঠছে কে জানে। কিন্তু বিশু খুব নিবিষ্টভাবে লক্ষ করে দৃশ্যটা আর আশ্চর্য হয়ে ভাবে, এই ছোট্ট ঘটনাটা সে ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। কেউ জানে না, কেউ টের পাচ্ছে না, কেউ দেখছে না যে, মস্ত মাঠের অগুন্তি ঘাসের ডাঁটির একটিতে একটা বোকা পিঁপড়ে ধীরে ধীরে উঠছে। উঠল, চারদিক বুঝি চেয়ে দেখল একটু, তারপর ফের নামতে লাগল। কি মিষ্টি, বোকা, ছোট্ট একটু ঘটনা। পিঁপড়েরা মাঝে মাঝে এমনি মিছি মিছি পরিশ্রম করে।

এইরকম কত কি ঘটে যায়, যা পৃথিবীর আর কেউ দেখে না, জানেও না। শুধু বিশু জানে। একা বিশু। কেষ্টদের বাড়ির পিছনের কচুবনে একখানা আধুলি পড়ে আছে কবে থেকে, কেউ কি জানে! বিশু কখনও পয়সা কুড়োয় না। তার দাদু বলেন, পয়সা কুড়োলে যা কুড়োবি তার দশগুণ তোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। কুড়োয় না ঠিকই, তবে মাঝে মাঝে সে গিয়ে আধুলিটাকে দেখে আসে। একটা লজ্জাবতী লতার ঝুপসি ছায়ায় পড়ে আছে। তাকে দেখলেই করুণ নয়নে চেয়ে আধুলিটা বলতে চায়, নাও না আমায়।

কেউ জানে না, নলিনী স্যারকে সাঁঝবাজার থেকে ফেরার পথে এক সন্ধেবেলা কানাওলা ভূতে ধরেছিল। কানাওলা ধরলে কিছুতেই আর চেনা পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল, বেভুল ঘুরে ঘুরে মরতে হয়। হাটখোলার কাছে স্যার তাকে দেখে বললেন, খোকা, একখান কথা শুনবা? আমারে মনে লয় কানাওলায় ধরছে। আমারে তুমি চিনতে পারতাছো তো! আমার লগে লগে গিয়া আমারে বাড়ি পর্যন্ত একটু আউগাইয়া দিবা? কাউরে কিন্তু ঘটনাটা কইও না।

বলেওনি বিশু। শুধু সে জানে, আর স্যার। আর কেউ নয়

সেদিন নিঝুম দুপুরে রুকুদিদি যখন পেয়ারাগাছের নীচে বসে গোল কাঠের ফ্রেমে একখানা কাপড় আটকে সুতোয় ডিজাইন তুলছিল তখন টেরও পায়নি তার বেণী বেয়ে বেয়ে উঠছিল একটা কাঠপিঁপড়ে। পিঁপড়েটার পেটটা লাল, আর দু'দিক কালো। কামড়ে সাঙ্ঘাতিক জ্বালা। রুকুদি বিভোর হয়ে একখানা

কী সুন্দর যে লতাপাতা ফুলের ছবি তুলছিল রঙিন সুতোয় ! ওই তন্ময় ভাব কাটিয়ে দিলে রুকুদি খুব চমকে যাবে । তাই বিশু পিঁপড়েটাকে আলতো চিমটিতে ধরে ফেলে দিল । আর তখনই কুটুস করে কামড়াল পিঁপড়েটা । চোখে জল এসে গিয়েছিল বিশুর । কিন্তু রুকুদি তো জানল না, কেউ তো জানল না । শুধু সে জানল, আর পিঁপড়েটা ।

ভগবান কত কী দেন না মানুষকে । এই যেমন রুকুদিদির বাবাকে ভগবান একটাও ছেলে দিলেন না । দিলেন শুধুই মেয়ে । সাত-সাতটা মেয়ে । রুকুদিরা সাত বোন : রুকুদির বাবা অঘোরবাবু প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, আমার সাতটা মেয়েই ভাল, যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি স্বভাবচরিত্রে, তেমনি কাজেকর্মে, তেমনি সেবায় । কিন্তু তা বলে ওদের একটা ভাই থাকবে না ? ভগবানের এটা কেমন অবিচার ?

একদিন রুকুদি দুঃখ করে বিশুকে বলেছিল, আমরা জন্মে বাবার দুঃখই বাড়িয়ে দিয়েছি । কেন যে জন্মালাম ! হ্যাঁ রে, এমন কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না যা খেলে মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে যাওয়া যায় ? আমার খুব ছেলে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে ।

বিশু ভারী অবাক হয়ে বলে, এ মা ! তুমি ছেলে হবে কেন ? ছেলে হলে তোমাকে বিচ্ছিরি লাগবে যে ! ছেলেদের যে গোঁফ-দাড়ি হয়, ছোটো করে চুল ছাঁটে, আর মোটা গলায় কথা বলে ।

রুকুদি হেসে ফেলেছিল, তাতে কি ? তবু তো বাবা খুশি হত ! আমরা সাত বোনে মিলে বাবার জন্য কত করি বল তো । সারাক্ষণ ঘিরে থাকি, বাতাস করি, ঘামাচি মেরে দিই, পিঠে সুড়সুড়ি দিই, একটুও বায়না করি না । তবু...

জলভরা চোখ, গলায় কান্নার কাঁপন, রুকুদি চুপ করে যায় ।

বিষণ্ণতা একদম সহ্য হয় না বিশুর । চোখের জল, মুখ ভার, উদাস ভাব এসব তার দু চোখের বিষ ।

এক এক দিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে বিশু শুনতে পায়, মাতাল হরিদাস কাঁদে । ঘুনঘুনে বুকভাঙা কান্না । বিশুর দাদু মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, লিভার পচে যখন গন্ধ বেরোবে তখন বুঝবে বাবা । মাতাল হরিদাসকে এমনিতে বিশুর খুব ভাল লাগে । মোটাসোটা শান্ত মানুষ । ভীষণ ঠাণ্ডা, কম কথা বলে । সব সময়ে মুখে একখানা হাসি-হাসি ভাব । লোকে বলে, যখন মদ না খায় তখন হরিদাসের মতো মানুষ হয় না ।

কিন্তু কাঁদে কেন হরিদাস ? কিসের দুঃখ ? তার তিন কুলে কেউ নেই । সে

দিব্যি ধানকলে কাজ করে আর খায় দায় । তবে দুঃখ কিসের ? একদিন সকালে হরিদাস বাঁখারি বেঁধে নিজের ঘর মেরামত করছিল । এইসব হাতের কাজ দেখতে বিশু বড় ভালবাসে । যেখানে যা হয় সে সব গিয়ে দেখে আসে । বেড়া বাঁধা, কুয়ো খোঁড়া, চিঁড়ে কোটা । সব । তার দিয়ে বাঁখারি বাঁধতে বাঁধতে হরিদাস দেওঘরে তিলকূট খাওয়ার গল্প করছিল । তিলকূট খাওয়ার গল্পটা একটুখানি, কিন্তু হরিদাস তা এমন বাখনাই করে বলে যে, হাঁ করে শুনতে হয় । গল্প করতে বসলে হরিদাস একেবারে মেতে যায় । তখন এক ফাঁকে বিশু বলল, আচ্ছা হরিকা, তুমি মাঝে মাঝে কাঁদো কেন ?

মাতাল হরিদাস কথাটা নিয়ে একটু ভাবল । তারপর খুব করুণ মুখ করে বলল, ঐ তো হল মুস্কিল । ছাইভস্মগুলো খেলেই যে আমার সব কষ্টের কথা মনে পড়ে ।

তোমার আবার কষ্ট কিসের ?

আমার নিজের কষ্টের কথা ভাবি না । দিব্যি আছি, খাইদাই ঘুরে বেড়াই । কিন্তু পেটে ওই খারাপ জিনিসগুলো ঢুকলেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায় । কাল রাতেই তো এক কাণ্ড । সেই যে নিতাই পোড়েলের তিন বছরের বাচ্চাটা রেলে কাটা পড়ে মরল গত বছর জষ্টি মাসে, হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে এমন কাঁদলুম যে বুক ভেসে গেল । অনেক মানত-টানত করে কত কষ্টে হয়েছিল বাচ্চাটা । সাতবেড়ের শিবমন্দিরে মানতের পুজো দিয়ে ফেরার পথে বোনের বাড়িতে দু'দিন থাকবে বলে এসেছিল । তা বোনের বাড়ি রেললাইনের গায়ে । নিতাই পোড়েল ভগ্নীপতি সঙ্গে বেরিয়েছে, তার বউ আর বোন বসে গল্প করছে, বাচ্চারা বাইরে কোথায় খেলছে । এমন সময় ট্রেনের ঘন ঘন বাঁশি আর গেল-গেল ধর-ধর চিৎকার । মা-টা যখন পাগলের মতো ছুটে গেল তখন সব শেষ খেলতে খেলতে কখন রেললাইনের ধারে নুড়ি কুড়োতে চলে গিয়েছিল বাচ্চারা । বোনের বাচ্চারা সেয়ানা, তারা রেললাইনের ধারেই মানুষ । কিন্তু নিতাইয়ের বাচ্চাটা তো তা নয় । সময়মতো সরে আসতে পারেনি । কাল রাতে সেই পুরনো ঘটনাটা কেন যে মনে পড়ল এত । ভাবছিলুম, নিতাইয়ের বউটা যদি অত অসাবধান না হত যদি সামলে রাখত তা হলে বাচ্চাটা আজও বেঁচে থাকত । এই সব আবোল তাবোল কত কী মনে পড়ে । সকালবেলায় বসে বসে ভাবছিলুম, আমি খুব আহাম্মক, নইলে কোথাকার কে নিতাই পোড়েল, তার বাচ্চা সেই কবে ফৌত হয়ে গেছে, তারাও এখন হয়তো ভুলেটুলে গিয়ে দিব্যি হাসছে খেলছে গল্প করছে, তবে আমি কেন কেঁদে

মরলুম ! কিছু ভেবে পাই না

বিশুর চোখ একটু ছলছল করছিল । তারও কেন কষ্ট হচ্ছে তা হলে অচেনা অজানা একটা বাচ্চার জন্য ?

হরিদাস হাতের কাজ থামিয়ে খানিকক্ষণ আকাশমুখো চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, দুনিয়ার জন্য আমার অনেক কিছু করার ছিল, বুঝলে ! কিছুই করিনি । ভগবানের দান এই জীবন, ভগবানের দুনিয়াটার জন্যই কিছু করা হল না তো, সেই সব পাপ রাতের বেলা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে ওঠে । তখন বড় কষ্ট হয় । সেই কবে একটা এই তোমার বয়সী ছেলেকে দেখেছিলুম, পটলের দোকানের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পাঁউরুটি দেখছে । বোধ হয় খুব খাওয়ার ইচ্ছে । একবার মনে হল বলি, ও খোকা খাবি পাঁউরুটি ? খা না । আমি পয়সা দেবোখন । তা অবিশ্যি শেষ অবধি আর বলিনি । মাঝে মাঝে মাতাল হলে সেই ছোঁড়াকে দেখতে পাই যেন । আহা, বোধহয় খিদে পেয়েছিল খুব, আমার পকেটে পয়সাও ছিল, কেন যে দিলুম না । আর তো তাকে খুঁজে পাবো না, লাখোজনের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে । এখন মনে পড়ে আর খুব কষে কান্না আসে । আমার হল ওই বিপদ ।

বিশু বলে, আমারও তোমার মতো হয় হরিকা ।

হরিদাস আহ্লাদের গলায় বলে, খুব ভাল । ভগবানের দুনিয়ার জন্য কিছু করে যেতে হলে ওইটে চাই । তবে আমার তো এমনিতে হয় না । মাতাল হলেই শুধু হয় ।

মাতাল হলে কেমন লাগে তা তো জানে না বিশু । বড় হলে সে একবার মাতাল হয়ে দেখবে ।

তবে সে এটা বেশ বুঝতে পারে যে, ভগবান যেমন অনেক কিছু দেন, তেমনি অনেক কিছু দেনও না ।

নয়নখ্যাপাকে ভগবান দিয়েছেন ফুর্তি আর অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ । নয়ন হাটখোলার গাছতলায় বসে খুব হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে আর চেঁচায়, তেজাং গোলি ! তেজাং গোলি ! আকুড়-কুড় তেজাং গোলি...

বিশু তার কাছে গিয়ে বসে বসে দেখে, নয়নের মুখে সব সময়ে একটা খুশিয়াল ভাব । হাসি উপচে পড়ছে মুখে । মাথার ওপর চাল নেই, পেটে ভাতের জোগাড় নেই, ছেঁড়া ট্যানা ছাড়া পোশাক নেই, মা নেই, কেউ আদর করে না । তবু এত খুশি কেন নয়ন ? সব সময়ে আনন্দে ডগমগ করছে । বৃষ্টিতে হাপুস হয়ে ভেজে, রোদে পোড়ে, ধুলোয় পড়ে থাকে । নয়নের কাছে

বসে বসে বিশুর মনটা ভাল হয়ে যায়।

ও নয়নদা, বৃষ্টি পড়লে হাটখোলার চালের নীচে যেতে পারো না?

যাবো কেন? এটা যে আমার বাড়ি।

দূর! গাছতলা বুঝি কারও বাড়ি হয়?

চুপ! কিণ্টু কাসিং। ডিগ ডিগ ডিগ ক্যালেন্ডারিং। কেলেটারিং, ল্যাকাভুট, ফিনিশ...

ওটা কি ইংরিজি?

ইয়েস।

বিশু হি হি করে হাসে। এটা নাকি ইংরিজি।

ভুটকোরাস। ভুটকোরাস। তেজাং গোলি।

এর মানে কি নয়নদা?

খ্যাট খ্যাট খ্যাট টেলারিং। ঝাবাবুদের মেলা কিকসুং আছে, না রে? খুব গ্যালটারিং ব্যাপার।

তুমি এমন ইংরিজি শিখলে কোথায় নয়নদা?

ইংলিশ ল্যান্ড। লন্ডন। মেমসাহেবরা কাপড় তুলে নাচে, জানিস? চীনেরা ব্যাং ভাজা খায়। আলুসেদ্ধ আর মিন্ড। কাপেটিং।

কখনও কেউ একটা জামা দেয়। কেউ একটু ফেলে-দেওয়া খাবার। বাচ্চারা ঢিলও মারে। নয়নখ্যাপা কিছু গায়ে মাখে না। দিব্যি আছে।

ঝা বাবুদের বাড়িতে এলেই বিশুর মন ভাল হয়ে যায়। খুব উঁচু দেয়ালে ঘেরা মস্ত জায়গা নিয়ে ঝা বাবুদের বাড়ি। কত গাছপালা, আর কী সুন্দর ছায়া আর রোদ এখানে। সকাল থেকেই ঝা বাবুদের বাড়ি রোজ সরগরম। হুলুস্থুল সব কাণ্ড হচ্ছে সেখানে। কোথাও মোষের দুধ দোয়ানো হচ্ছে, কোথাও উদুখলে আর হামানদিস্তায় গুঁড়ো হচ্ছে মশলা, জাঁতায় ভাঙা হচ্ছে ডাল, কোথাও তৈরি হচ্ছে পাঁপড়ের নেচি, কোথাও বা বানানো হচ্ছে হাজারো রকমের আচার। তিনটে দেহাতি চাকর, তিনজন দেহাতি কাজের মেয়ে আর ঝা বাবুদের বাড়ির মোটা মোটা আহ্লাদি চেহারার রুপোর গয়নাপরা ঘোমটা দেওয়া বউ-ঝিরা দিন-রাত শুধু কাজ করছে। মোষের ডাক, কুকুরের চিৎকার, মানুষের কথাবার্তায় বাড়িটা সব সময় ডগমগ করছে যেন। এ যেন উৎসবের বাড়ি।

গঞ্জের বাজারে কিষুণ ঝার মস্ত পাইকারি দোকান। কাছাকাছি যত হাটবাজার আছে সব জায়গার দোকানদাররা মাল কিনতে ঝা বাবুদের দোকানে ভিড় করে। লাখো টাকার কারবার। বাবার সঙ্গে একবার সেই দোকানে

গিয়েছিল বিশু। বেশি দূর নয়। মরা খাল পেরিয়ে হবিবগঞ্জ বাঁয়ে ফেলে মাইলখানেক হাঁটলেই গঞ্জের বাজার। বাজারের মাঝখানে একটা পুরনো দালানে মস্ত দোকান। সেই দোকানের ভিতরে ঢুকলেই মশলা, হিং, পাঁপড়, আটা, বস্তা, ধুলো সব কিছু মেশানো একটা ভারী অদ্ভুত গন্ধ আসে নাকে। ইচ্ছে করে, অনেকক্ষণ দোকানটায় বসে থাকে। সেখানে শুধু বিকিকিনি আর বিকিকিনি। বড় ভাল লেগেছিল বিশুর। ঝা বাবুদের দোকানে বা বাড়িতে সব জায়গায় কেবল কাজ আর আনন্দ।

বিশু মাঝে মাঝে বিমলকে জিজ্ঞেস করে, তোদের কোনও দুঃখ নেই, না রে?

কিষুণ ঝার নাতি বিমল বিশুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। খুব গবেট। তার লেখাপড়ায় মাথা না থাকলে কি হবে, ব্যবসায় নাকি খুব মাথা। বিশুর প্রশ্ন শুনে সে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভেবে বলল, নেই কি আর। খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে।

বিমল তাকে একবার এক গেলাস গরম মোষের দুধ খাইয়েছিল। বিশুর সহ্য হয়নি। পরদিন পেট ছেড়ে দিয়েছিল।

দাদুর কাছে গেলেই হত্তুকির পবিত্র একটা গন্ধ পাওয়া যায়। দাদু তার মাথায় আঙুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে, টাকা থাকলেই যে দুঃখ থাকে না তা কিন্তু নয়। কত পয়সাওলা লোকেরও কত জ্বলুনি থাকে। আসল কথা হল মন। মনটাকে যেমন সই করবে তেমনই থাকবে। মানুষ তো কেবলই চায়। এটা চায়, ওটা চায়, সেটা চায়। ওই থেকেই মনটা বিগড়োয়। চাওয়ার ভাবটা রাখতে নেই।

দাদু হচ্ছে বিশুর বুড়ি। ঘুরতে ঘুরতে খেলতে খেলতে এক-একবার করে এসে, বুড়ি ছুঁয়ে যায়। ভয় পেলে, ব্যথা পেলে, রাগ হলে সে ছুটে চলে আসে দাদুর কাছে তা তার দাদু হরপ্রসন্ন তপাদার আরও অনেকেরই বুড়ি। পুজোপাঠ, যজমানি, কথকতা, কীর্তনের জন্যই শুধু নয়, লোকে বেকায়দায় পড়লে পরামর্শ নিতে আসে, মামলা-মোকদ্দমার মিটমাট করাতে, ঝগড়া-কাজিয়া-বখেরা নিয়েও আসে। তবে তার দাদুর কাছে যে-লোকটা এলে বিশু সবচেয়ে ভয় পায় সে হল খুনে রামহরি।

কালীবাড়ির বড় পুজোয় মানসিকে অন্তত ত্রিশ চল্লিশটা পাঁঠা বলি হতে আসে। রামহরি ঝপাঝপ সেগুলো কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। লোকে বলে, পাঁঠা তো পাঁঠা, রামহরি যে কত মানুষ কেটেছে তার হিসেব নেই। কী দুখানা

চোখ! বাপ রে! এমন পাগুলে দৃষ্টিতে তাকায় যে রক্ত জল হয়ে যায় মানুষের।

মাঝে মাঝে ভরসন্ধেবেলা, যখন চারদিকে ভুতুড়ে আঁধার ঝেঁপে আসে ডানা মেলে, বাড়িতে বাড়িতে বিপদ সংকেতের মতো শাঁখ বাজতে থাকে, তখন নিঃশব্দে একটি ছায়ার মতো আসে রামহরি। দাওয়ায় জলচৌকিতে বসে সেই সময়টায় দাদু নীরবে ঠাকুরের নাম করে। একটু দূরে উবু হয়ে বসে থাকে রামহরি। চুপচাপ। অন্ধকারে তখন তাকে মানুষ বলে মনেই হয় না।

দাদুর নাম-করা শেষ হলে রামহরি কী যেন ফিসফিস করে বলে। অনেকক্ষণ ধরে বলে। তারপর দাদু একসময়ে নরম গলায় বলে, আজ যা। আবার আসিস।

রামহরি যেমন এসেছিল তেমনি চলে যায়।

বিশু গিয়ে দাদুকে পাকড়াও করে তখন, ও দাদু, রামহরি তোমার কাছে কেন আসে?

এমনি আসে। মন চায় তাই আসে। কোথাও তো ওর শান্তি নেই।

কী বলে তোমাকে?

কী আর বলবে। কত পাপ করেছে। সেই সব কথা বলে।

পাপ কাকে বলে তা ভাল করে জানে না বিশু। সে যে পাগলুদের বাড়ির পেয়ারা চুরি করে খায় সেটা কি পাপ? সে যে একবার ফটিকের হাতে চিমটি কেটে পালিয়েছিল সে কি পাপ? বর্ষাকালে ডোবার সোনাব্যাংগুলোকে ঢিল মারা কি পাপ?

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলেই ভূতের হাতে চলে যায় পৃথিবী। তখন হ্যারিকেনের সামনে পড়ার বই খুলে বসে সে ভাত ফুটবার গন্ধ পায়, ডালে সম্বরা দেওয়ার শব্দ আসে। আঢ্যদের বাড়ির বুড়ো যতীনবাবুর কাশির শব্দ আসে। পড়ার বইয়ের ওপর ঝুঁকে আসে মাথা। সাঁঝরাতেই ঘুমিয়ে পড়ে বিশু।

আর তখন তার ঘুমের মধ্যে নেমে আসতে থাকে ভূত, পরী, ভগবান, আরও কত কে!... রুকুদিদির একটা ভাই হয়েছে সকালবেলায় আর বিশু খবর পেয়ে ছুটছে পথে পথে আর চিৎকার করছে, রুকুদিদির ভাই হয়েছে!... রুকুদিদির ভাই হয়েছে!... ছুটতে ছুটতে পড়ে গেল বিশু। উঠে দেখল, রামহরি একখানা মস্ত ছোরা হাতে মাঠ পেরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, আর ছোরাটা থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। তাকে দেখে রামহরি চাপা গলায় বলে, কাউকে বোলো না কিন্তু খোকাবাবু। বিশু ভয়ে আর্তস্বরে বলে ওঠে, বলব না! বলব

না !... মাতাল হরিদাস ডুকরে কেঁদে ওঠে হঠাৎ, আহা রে, কলকে ফুলের গাছটা যে শুকিয়ে মরে গেল ! ওফ, কত দুঃখই যে আছে দুনিয়াতে ভাই রে !... টিফিনের সময় ক্লাসঘরে বিমল তাকে ফিসফিস করে বলতে থাকে, আমাদের বাড়িতে একটা আলমারি আছে, জানিস ? কখনও খোলা হয়নি । দাদু ওটা এক রাজবাড়ি থেকে কিনেছিল । চাবি নেই বলে খোলা যায় না । দাদু কী বলে জানিস ? ওটা খুললেই নাকি পিলপিল করে হাজার হাজার দুঃখ বেরিয়ে আসবে পিঁপড়ের মতো ।... ওই তো চলেছেন নলিনী স্যার । নিজের বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, একে ওকে জিজ্ঞেস করছেন, শোনো হে, আইচ্ছা কইতে পারো আমি কোন বাড়িটায় থাকি ? আমারে চিনলা তো । আমি হইলাম গিয়া নলিনী স্যার ।... দুঃখী দেবীলাল একগাদা বাসন নিয়ে বসেছে কদমতলায় । তার মুখে খুব হাসি । কাছেই বসে আছে নয়নখ্যাপা । দু'জনেই হাসছে খুব । সামনে কাঠকয়লার আগুনে লোহার উকো তাতিয়ে তুলছে দেবীলাল...ঝা বাবুদের বাড়িতে জাঁতা ঘুরছে...খুব ঘুরছে । কে ডাকল, বিশু । ও বিশু ।

মা খেতে ডাকছে । বিশু ধড়মড় করে উঠে বসে ।

॥ দুই ॥

দিল্লি থেকেই ট্রেনটা ছেড়েছিল চার ঘণ্টা দেরিতে । পরশু দিন বাংলা বন্ধ থাকায় গাড়ি সময়মতো পৌঁছোয়নি, তাই দেরি । বিকেল চারটের ট্রেন ছাড়ল রাত আটটায় । তখনই বোঝা গিয়েছিল, কপালে দুর্ভোগ আছে । এ সি টু টায়ারের আরামদায়ক নিরাপত্তায়ও কিছু লোক উদ্বেগ বোধ করছে । বিকেল দুটো নাগাদ এ সি ডিলাক্স এক্সপ্রেস হাওড়ায় পৌঁছনোর কথা । সেটা স্বাভাবিক নিয়মে । চার ঘণ্টা যোগ করলে দাঁড়াবে রাত দশটা । কিন্তু বিলম্বিত ট্রেনের ভাগ্যও বিড়ম্বিত বলে ভারতীয় রেলের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী আরও দু-তিন ঘণ্টা দেরি হতে পারে । রাত বারোটা একটায় হাওড়ায় পৌঁছে একটিও ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না, কোথাও পৌঁছানো অসম্ভব । ভোর পর্যন্ত বসে থাকতে হবে স্টেশনে । কী গেরো !

উত্তেজনায় উদ্বেগে শ্যামল বারে বারে উঠে সিগারেট খেতে করিডোরে যাচ্ছে আর কন্ডাকটর গার্ড এবং সহযাত্রীদের সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময় নিয়ে জরুরি আলোচনা সেরে আসছে । তার সঙ্গে বউ-বাচ্চা-লটবহর ।

বকুল একটা ধমক দিল, তুমি অত অস্থির হচ্ছো কেন বলো তো ! এ ট্রেনে তো আরও হাজার কয়েক প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে, না কি : তাদের যা হবে আমাদেরও তাই হবে । অত চিন্তা কিসের ?

শ্যামল যথাসাধ্য শুকনো গলাকে মোলায়েম করে বলে, আহা, তুমি বুঝছো না...

খুব বুঝছি । একটুতেই তোমার অমন টেনশন হয় কেন ? আর একটাও সিগারেট খাবে না কিন্তু খাবারের আগে । গত আধ ঘণ্টায় বোধহয় চারবার উঠে গেলে !

হাওড়া স্টেশনে রাত কাটানো মানে বুঝছো তো ! হরিবল । টুকুসটার কত কষ্ট হবে !

কিছু হবে না । গাদা গাদা বাচ্চা যাচ্ছে এই ট্রেনে । তাদেরও তো কষ্ট হবে !

আহা, আমি সকলের কথাই ভাবছি । মানে, আমাদের সকলেরই কষ্ট হবে । বাংলা বন্ধ-এর কথাটা মাথায় ছিল না, থাকলে...

থাকলে কী করতে ? আজকের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করতে ? এখন পুজোর পর সকলের ফেরার রাশ, আগামী পনেরো দিনেও রিজার্ভেশন পেতে না । পনেরো দিন বসে থাকতে দিল্লিতে ? কী বুদ্ধি !

ওয়েল, আমি তোমার মতো অত স্পোর্টিং নই । এই ঝামেলা এড়াতে অন্তত প্লেনে একটা চেষ্টা করা যেত ।

তোমার মাথাটা আজকাল একদম নরম্যালি কাজ করছে না । ট্রেন মাত্র চার ঘণ্টা লেট বলে প্লেনে উঠতে ? টাকা এত সস্তা হয়েছে নাকি আমাদের ? বছরে চারবার প্লেনের ভাড়া বাড়ে, সেটা জানো ?

শ্যামল গুম হয়ে বসে রইল । টুকুস এখনো ঘুমোচ্ছে । নির্বিঘ্ন ঘুম । ট্রেন লেট হোক চাই না হোক, ওর কিছু যায় আসে না । এই শিশুকালটাই ভাল, দুনিয়ার এত দিকদারি, টেনশান, ছোটখাটো অশান্তি, ওকে এসব স্পর্শই করে না ।

শ্যামল আবার উঠতে যাচ্ছিল । বকুল একটা ধমক দিল, আবার কোথায় যাচ্ছো ?

চোরের মতো মুখ করে শ্যামল বলে, একবার মাসীমাকে দেখে আসি ।

দেখার কী আছে । মাসীমা স্মার্ট মহিলা, সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন । শী ক্যান লুক আফটার হারসেলফ্ ।

একটা কার্টসি তো আছে ।

শ্যামল উঠে গেল । বকুল ম্যাগাজিনের ছবি দেখতে লাগল ।

মাসীমা আছেন একেবারে শেষ কিউবিকলে । অনেকটা দূর । জায়গা বদল করে একই কিউবিকলে ব্যবস্থার কথা বলেছিল শ্যামল, মাসীমা—হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক—মৃদু হেসে বলেছেন, থাক গে, কী দরকার ? আমার কোনও অসুবিধে নেই । কম্পার্টমেন্ট তো একই । আমি তো একা একাই দুনিয়া ঘুরে বেড়াই ।

মাসীমা—অর্থাৎ বিনয়ের মা—সত্যিই বিশ্বজনীন মানুষ । তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে শুধু বিদেশ-ভীত বিনয়টাই পড়ে আছে দিল্লিতে । বার দুই বিদেশে গিয়ে দেখেছে, ফরেন তার সহ্য হওয়ার নয় । দিদি ও দাদাদের ছিছিক্কার মাথা পেতে নিয়ে সে দিল্লিতেই ধানা গেড়েছে । তার জীবনের প্রবলতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা হল কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসা এবং জমিয়ে আড্ডা দেওয়া । রানীক্ষেত, নৈনিতাল, হরিদ্বার ঘুরে ফেরার পথে বিনয়ের কালকাজির বাড়িতে তিন দিন ছিল শ্যামল তিন দিন বিনয়ের গাড়িতে আগ্রা-টাগ্রা ঘুরে, দিল্লিতে প্রভূত মার্কেটিং করে, কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আর আড্ডা মেরে সময়টা কেটেছে দারুণ । মাসীমা তখন ওখানে মজুত । তিনিও কলকাতায় আসবেন । স্বামীর ভিটে একবার ভিজিট করেই রওনা দেবেন সুইডেন, মেয়ের বাড়িতে । ভিটেটা অবশ্য দেখার মতো । আয়রনসাইড রোডে বাগানঘেরা পেল্লায় বাড়ি । কেমন একটা প্যালেস-প্যালেস ভাব আছে । সেখানে থাকে এক বুড়ো কেয়ারটেকার আর মাসীমার এক নিঃসন্তান বিধবা ভাইঝি । প্রকাণ্ড বাড়িটা একরকম স্থায়ীভাবে ফাঁকা । শ্যামল মাঝে মাঝে ভাবে, যাদের আছে তাদের এত বেশি আছে কেন ? কলকাতায় এক টুকরো ঘরের জন্য এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি আর এদের অত বড় বাড়ি অবহেলায় ফাঁকা পড়ে থাকে ।

শেষ কিউবিকলে মাসীমা ছাড়া তিনজনই পুরুষ । মাসীমার পরনে সাদা ধবধবে থান, চোখে ফিতে বাঁধা চশমা, চেহারায় সম্ভ্রমাত্মক ভাব । ছোটখাটো, ফর্সা, শান্ত চেহারার ভদ্রমহিলা । বয়স সত্তর-টত্তর হবে । ফিট । আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ইংরিজি খবরের কাগজ দেখছিলেন ।

মাসীমা, কখন যে গাড়ি কলকাতা পৌঁছবে !

বোসো । বলে মাসীমা একটু জানালার দিকে সরে গেলেন, পাশে রাখা বিদেশী হ্যান্ডব্যাগটা সরিয়ে নিলেন ।

শ্যামল বসল । ভিতরটা উচাটন । ট্রেনটা যথেষ্ট জোরে চলছে বলে তার

মনে হচ্ছে না। টাইম মেক আপ করার ইচ্ছে কি আছে এদের! যদি অন্তত আধ ঘণ্টাও মেক আপ করতে পারত তা হলে সাড়ে ন'টায় পৌঁছনো যেত হাওড়ায়। উঃ, যদি একটু জোরে চালায় এরা গাড়িটা! যদি রাস্তায় আর লেট না হয়!

টুকুস ঘুমিয়েছে বুঝি?

অ্যাঁ! বলে চিন্তাকুল শ্যামল যেন চটকা ভেঙে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাই ভাবছি। নইলে একবার ঠিক আমার কাছে আসত। তিন দিনেই যা ভাব হয়ে গেছে আমাদের!

মাসীমা—অর্থাৎ মুক্তিদেবীর ডান হাতে একখানা মস্ত হীরের আংটি। একখানা বিছেহার গলায়। আর কোনও গয়না নেই। হীরের বাজারদর শ্যামলের জানার মধ্যে পড়ে না, সোনার দর সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা আছে মাত্র। কিন্তু তার সন্দেহ মাত্র এই দুই আইটেমেই হাজার ত্রিশ চল্লিশ পড়ে যাবে।

ইয়ে, মাসীমা, হাওড়া থেকে অত রাতে তো আপনাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া যাবে না। আমরা কি সঙ্গে যাবো?

মনে মনে অপব্যয়টার একটা হিসেবও করে নেয় শ্যামল। তার ফ্ল্যাট কাকুড়গাছিতে। মাসীমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে কাঁকুড়গাছি যাওয়া মানে বিশ পঁচিশ টাকা বাড়তি খরচ।

মাসীমা অবশ্য হাসি হাসি মুখ করে বললেন, তা কেন। আমাকে পৌঁছোনোর কোনও দরকার নেই তো! আমার ভাসুরপোর গাড়ি নিয়ে আমাদের কেয়ারটেকার যদু স্টেশনে থাকবে। পুরনো লোক, যত রাতই হোক ঠিক মোতায়েন থাকবে।

শ্যামল একটা শ্বাস ফেলল। ওঃ, তাই এত নিশ্চিন্ত! বড়লোকদের জন্য সব ব্যবস্থাই থাকে। যাদের ভগবান দেয় তাদের এত দেয় যে ভগবানের চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত থাকে না। দিতেই থাকে, দিতেই থাকে। ভগবান টগবান মানে না শ্যামল, কিন্তু রেগে গেলে, উত্তেজিত হলে সে একজন অদৃশ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে ফর দি টাইম বিয়িং ভগবানকে খাড়া করে নেয়। তাতে নিজস্ব লজিকগুলো শানিয়ে নিতে তার সুবিধে হয়। আর এই ভদ্রমহিলা মানে সো কল্ড মাসীমা—ইনিও তো নিজে থেকে একবার বলতে পারেন, বাবা শ্যামল, তুমি বরং আমার গাড়িতেই যেও। নইলে মালপত্র বউ বাচ্চা নিয়ে মুস্কিলে পড়বে।

কিন্তু বলল না   এই সৌজন্যটুকু এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক প্রত্যাশা নয় । যখন বললই না তখন শ্যামলেরই কি লজ্জার মাথা খেয়ে বলা উচিত, ইয়ে মাসীমা, আপনার খুব অসুবিধে না হলে.... মানে কাঁকুড়গাছি... কাছেই... মানে বউ-বাচ্চা-মালপত্তর... কলকাতা শহর, বুঝতেই পারছেন । লোকে তো এইভাবেই ম্যানেজ করে, নাকি ? বলিয়ে কইয়ে স্মার্ট লোকেরা আরও কত কঠিন পরিস্থিতিকে শুধু বুকনি ঝেড়ে জল করে দেয় । সে এটুকু পারবে না ? গলা খাকারি দিয়ে তৈরি হল শ্যামল । দ্বিধা সংকোচের যে কর্কটা তার গলায় আটকে গিয়ে সঠিক পরিস্থিতিতে সঠিক কথাটা কিছুতেই বলতে দেয় না সেটাকে খুলে ফেলার জন্য গলাটা আর একবার ঝেড়ে নিয়ে সে একরকম চোখ বুজে মুখ খুলল । এবং বলেও ফেলল ।

কিন্তু যা বলল তা মোটেই তার উদ্দিষ্ট কথা নয় । খুবই অবাক হয়ে সে শুনতে পেল যে, সে বলছে, মাসীমা, কলকাতার বাড়িটা তাহলে ডিমলিশ করে ফেলাই ঠিক করলেন ?

কি করব বলো । আমরা কেউ থাকি না, অত বড় বাড়ি মেনটেন করে কে ? ট্যাক্সও তো কম নয় । আমার দাদাশ্বশুর তিন ছেলের জন্য তিনটে বাড়ি করে রেখে গিয়েছিলেন, ভাসুরপোরা কবে তাদের বাড়ি ভেঙে মাল্টি স্টোরিড করে নিয়েছে । শুধু আমাদেরটাই পড়ে আছে ।

কোনও আগ্রহ নেই জানবার তবু কথাটা যখন উঠে পড়েছে তখন কথার ঝোঁকেই শ্যামল বলল, কিরকম বন্দোবস্ত হল ?

হয়নি । সেই সব কথা বলতেই কলকাতা যাওয়া । একজন প্রোমোটার গত জুন মাসে আমেরিকায় গিয়ে বেকোর্সফিল্ডে আমার ছেলের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করে এসেছে । মোটামুটি ঠিক হয়েছে চার ছেলে মেয়ে আর আমার জন্য পাঁচটা বড় ফ্ল্যাট দেবে, আমার ভাইঝি আর যদুর জন্য দুখানা ঘর ।

কে থাকবে ?

কে আর থাকবে ! এক বিনয় যদি কলকাতায় আসে তো থাকবে । বিদেশে যারা আছে তারা কেউ ফিরবে না এদেশে । তবে সবাই চায় কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বা কিছু থাক । ওটা একটা সেন্টিমেন্ট । কলকাতায় আমার একটা আশ্রয় আছে, এটুকু ভেবেই যা সান্ত্বনা । দুচার বছর পর এসে দুচারদিন থাকবে হয় তো ।

পুরোনো বাড়ি ভেঙে বহুতল বাড়ি ওঠার সব কাহিনীই প্রায় একরকম, খুব একটা ভ্যারিয়েশন নেই । এত একরকম যে, বস্তাপচা মনে হয় । কাজেই

মুক্তিদেবী তথা মাসীমার গল্পেও সেই রিপ্লে। শুধু একটা ব্যাপার শ্যামলের শ্বাসরোধ করে দেয়, এরা কত বড়লোক। যিশুখ্রিস্টই কি বলেছেন কথাটা যে, ছুঁচের ফুটো দিয়ে বরং হাতি গলে যাবে, তবু কোনও ধনী ব্যক্তি কখনও স্বর্গে পৌঁছোবে না! ওয়েল ওয়েল, মাই ডিয়ার জেসাস, এর চেয়ে বড় স্বর্গ আর কোন আহাম্মক চায়? তোমার স্বর্গ তো ঝোপের পাখি ধর্মাবতার। আরও একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিই অনারেবল জেসাস, তোমার সর্বশক্তিমান গডই যদি সব কিছুর মূলে আছে, তবে এই যে কিছু বড়লোক এবং তাদের তেলা মাথায় আরও তেল দেওয়া এটাও সেই কীর্তিমান একচোখো লোকটারই কাজ। বুঝলে জেসাস স্যার, তোমার গড হল পক্ষপাতদুষ্ট রেফারি যে দল জিতছে তাকেই ফের পেনাল্টি পাইয়ে দেওয়া ছাড়া এটা আর কী বলো তো! থাকবে না, তবু, পাঁচ পাঁচটা ফ্ল্যাটে তালাবন্ধ ফাঁকা পড়ে থাকবে! এইজন্যই তো লোকে কমিউনিস্ট হয়

কমিউনিস্ট লোকে আরও নানা কারণেই হয়, শ্যামলও বার কয়েক হয়েছে। এখনও যে সে কমিউনিস্ট নয় একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ সে এখন কমিউনিস্ট কিনা সেটা শ্যামলও জানে না। তবে ট্রেনটা যদি আরও এক কি দুই ঘন্টা লেট করে তবে ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠতে পারে।

শ্যামল একটা শ্বাস একটু ধীর ও গভীর ভাবে মোচন করে বলে, যাক মাসীমা, আপনার জন্য যে একটা গাড়ি থাকবে এটা জেনে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি তো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, গাড়ি না এলে আপনার তো খুবই অসুবিধে হবে।

মুক্তিদেবী আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটা হাসি হেসে বললেন, না না, তুমি একদম চিন্তা কোরো না। গাড়ি ঠিক আসবে। যদু নিজে থাকবে স্টেশনে। ত্রিশ বছরের পুরনো লোক।

তবু একবারও বলল না, আমার তো ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তোমার কি হবে বাবা শ্যামল! আমার গাড়িটা বরং তোমাদের পৌঁছে দিক।

বলল না। পোঁটলা পুঁটলি বাক্স বউ বাচ্চা নিয়ে চার পাঁচ ঘন্টা হাওড়ার উদোম প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা ছাড়া শ্যামল আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না আশু ভবিষ্যতে। কারণ দিল্লি থেকে ছেড়ে গাজিয়াবাদ পার হয়েই ট্রেনটা আবার থেমেছে। এবং অনেকক্ষণ থেমে আছে। ভোগাবে খুব ভোগাবে। শ্যামল একটু একটু কমিউনিস্ট হয়ে উঠছে কি?

মাসীমা নিচু হয়ে তাঁর স্যামসোনাইট স্যুটকেসটা সিটের তলা থেকে টেনে

বের করার চেষ্টা করছিলেন ।

দাঁড়ান মাসীমা ! বলে শ্যামল সেটা বের করে দিল । ঘ্যাম জিনিস । চব্বিশ ইঞ্চি, ষাঁড়ের রক্ত রঙা, কম্বিনেশন লকওলা স্যামসোনাইট । হার্ড টপ । এ দেশের বাজারে যদি বা পাওয়া যায় হেসে খেলে হাজার দুই টাকা দাম পড়ে যাবে ।

মাসীমা স্যুটকেস খুলে এক প্যাকেট লবঙ্গ বের করে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার বউকে দিও । এদেশে শুনি লবঙ্গর খুব দাম !

লবঙ্গ ! বলে শ্যামল একটু হাঁ করে রইল । লবঙ্গ তাদের কোন কাজে লাগবে সে মোটেই বুঝতে পারছে না ।

দারচিনি আর এলাচিও এনেছিলাম, সেগুলো দিল্লিতেই বিলি হয়ে গেছে । ভাল জিনিস তো এখানে পাওয়াই যায় না ।

শ্যামলের একবার বলতে ইচ্ছে করল, লবঙ্গ নয় মাসীমা, আই ওয়ান্ট এ লিফট ।

এই সময়ে ট্রেন ছাড়ল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বকুল এসে দাঁড়াল, এই, তুমি একটু টুকুসের কাছে গিয়ে বোসো তো । আমি বরং মাসীমার সঙ্গে গল্প করি ।

সর্বহারার অর্থহীন দৃষ্টিতে শ্যামল বকুলের দিকে চেয়ে লবঙ্গের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, লবঙ্গ !

লবঙ্গ ! বকুলের চোখ যেন ঝলমল করে উঠল, ওমা ! মাসীমা দিলেন বুঝি ! ইস্, কী দারুণ !

বলে শ্যামলের পরিত্যক্ত জায়গায় ঝুপ করে বসে পড়ে বকুল ।

দেখি মাসীমা, বিদেশ থেকে আর কী আনলেন !

এই যে দেখাচ্ছি ।

বকুল যদি ম্যানেজ করতে পারে তো প্রবলেমটা ফর্সা হয়ে গেল । রাত্তিরটা ভাল ঘুম হবে তার ।

টুকুস—তিন বছরের আদুরে মেয়েটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, নো প্রবলেম । ঠিক এইরকম একটা বয়সে স্থির থেকে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল । মানুষের বয়স বাড়ে, মাথা পাকা হয়, ততই বাড়ে প্রবলেম । এই যে টুকুস এত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এবং দুনিয়ার সব বাচ্চাই যে নিশ্চিন্তে খায় দায়, খেলা করে, ঘুমোয়, কোনও টেনশানে ভোগে না তার কারণ হচ্ছে ওরা টের পায় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, দুশ্চিন্তা পোয়ানোর জন্য ওদের বাবা, মা এবং বড়রা আছে । কিন্তু বড় হয়ে গেলে তখন আর সে সুবিধে নেই । সেইজন্যই কি লোকে ভগবান নামে

একজন বড় বাবাকে খাড়া করে নিয়েছিল ! যাতে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে খানিকটা শিশু হয়ে থাকা যায় ।

উল্টোদিকে দুজন গম্ভীর লোক । একজন মাড়োয়ারিই হবে বোধহয়, অন্যজন যুবক চেহারার । বাঙালি বলেই মনে হচ্ছে । চুপচাপ বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে । এ সি টু টায়ারে ডবল কাচ লাগানো থাকে জানলায় এবং কাচ যথেষ্ট ময়লা ও ঘোলা । দিন দুপুরেই বাইরেটা ভাল দেখা যায় না । রাতে তো কথাই নেই । তবু কিছু লোক চেয়ে থাকে । খামোখাই চেয়ে থাকে ।

আপনি কি কলকাতা অবধি নাকি ?

লোকটা ধীরে মুখটা ফেরাল । শ্যামল সামান্য একটু বিস্মিত হল মুখটা দেখে । খুবই বিষণ্ণ, শোকাহত চেহারা । কেউ মারা টারা গেছে নাকি ? ডেকে কথা বলে কি ভুল করল শ্যামল ?

সামান্য ভাঙা এবং ধরা গলায় যুবকটি বলল, আমাকে কিছু বললেন ?

সরি টু ডিস্টার্ব, না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম কলকাতা অবধি যাচ্ছেন কিনা ?

হ্যাঁ, কলকাতা ।

ট্রেন যা লেট চলছে, কখন যে পৌঁছোবে । বলে কথাটা ছেড়ে দিল ।

ছেলেটা মৃদুস্বরে বলল, পৌঁছোবে ।

ঐ যাঃ, বকুল তো জানেই না যে মাসীমার গাড়ি আসবে । না জানলে ম্যানেজ করবে কি ভাবে ? এখনই ওকে অ্যালার্ট করে দিয়ে আসা দরকার । ভেবে উঠতে যাচ্ছিল শ্যামল । হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, তাড়া কিসের । কাল সারা দিনটা তো হাতে আছে ।

আপনি কি দিল্লিতে থাকেন ?

ছেলেটা ফের জানালার বাইরে চেয়ে ছিল । বিষণ্ণ সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ, দিল্লিতে ।

ছোকরার যে একটা কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই । জখমটা হয়তো একটু গুরুতরই ।

সিগারেট চলে তো ?

সিগারেট ! হ্যাঁ, তা চলে ।

কী নুইসেন্স বলুন তো । এত টাকা দিয়ে লোকে এ সি টু টায়ারে ট্রাভেল করছে, কিন্তু সিগারেট খেতে হলে করিডোরে যেতে হবে । আমি একটু বেশি

স্মোক করি বলে আরও অসুবিধে হয় । অথচ সেকেন্ড ক্লাসে নো রেস্ট্রিকশন । এ সি ফার্স্ট ক্লাসেও স্মোকিং অ্যালাউড । ওনলি এই সব কম্পার্টমেন্টের জন্যই এ নিয়ম । মিনিংলেস ।

বলে শ্যামল উঠে পড়ে ।

ছেলেটা স্তিমিত গলায় বলে, আপনার মেয়েটা কি একা থাকবে ? বউদি রাগ করবেন না তো একা রেখে গেলে ? পড়ে টড়ে গেলে—

আরে না । শী ইজ এ কোয়ায়েট চাইল্ড । তবু আপনি যখন বলছেন—

বলে শ্যামল সিটের তলা থেকে বড় সুটকেসটা বের করে সিট ঘেঁসে খাড়া করে রাখল, নাউ শী ইজ সেফ । পাশ ফিরতে গেলে পড়ে যাবে না ।

কামরার ভিতরটা অনেকটাই শব্দহীন । কিন্তু করিডোরে রেল কাম ঝমাঝম শব্দে কান ফেটে যেতে চাইছে । ট্রেনটা হঠাৎ একটু বেশিই স্পীড দিল নাকি ? এত দুলছে যে দাঁড়ানোই কষ্টকর । এত স্পীড তো ভাল নয় বাপু ! ভারতবর্ষের রেল লাইনকে বিশ্বাস কি ? কোথায় নাটবল্টু আলগা হয়ে রয়েছে কে জানে বাবা । গাড়ি যদি রেল থেকে ছিটকে মাঠে নেমে যায় এই স্পীডে, তবে দলা পাকিয়ে যেতে হবে । উইথ টুকুস । অ্যান্ড বকুল । ভাবতেই কেমন গা শিরশির করে । তার ওপর দেশে যা টেরোরিজম শুরু হয়েছে ! কোথায় বোমা মেরে লাইন উড়িয়ে রেখেছে, কি লাইনে টাইম বোমা বা মাইন ফিট করে রেখেছে কে জানে !

সিগারেট ধরিয়ে শ্যামল বুক ভরে ধোঁয়া টানল । ছেলেটা অ্যামেচারিশ । সিগারেট ধরাল আনাড়ির মতো । বোধহয় চান্স স্মোকার ।

ট্রেনটা কেমন দৌড়চ্ছে দেখেছেন ? কোনও মানে হয় এত স্পীডে রান করার ?

ছেলেটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে ছিল । চোখ খুলে বলল, হ্যাঁ, ভাল । খুব ভাল ।

আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, ইউ আর ইন এ শক । এনি মিসহ্যাপ?

ছেলেটা সিগারেটের দিকে চেয়ে ছিল । মাথা নাড়ল, না ।

এসি টু টায়ার করিডোরে সর্বদাই কিছু উটকো লোক উঠে পড়ে । উবু হয়ে বসা দুজন ময়লা জামাকাপড়ওয়ালা হ্যাভ নটস কথাবার্তা বলছে একজন চাওয়ালা দুই বাথরুম এবং দু কামরার যোগাযোগের দরজার কাছে ব্যবসা করছে । তার সামনে দুজন হ্যাভস খদ্দের । খাবারের ট্রে হাতে রেস্টুরেন্ট কার

থেকে দুজন বেয়ারা ছিমছাম অভ্যস্ত পায়ে টাল না খেয়ে এসে ঢুকে গেল কামরায় ।

কণ্ডাকটরের ফোল্ডিং সিট পেতে চশমাধারী মাঝবয়সী কালো লোকটা চার্ট দেখে কী সব মেলাচ্ছিল ।

কণ্ডাকটর সাহেব, লেট কিছু মেক আপ হবে নাকি ?

লোকটা মাথা তুলে অতিশয় দার্শনিকের মতো বলল, কুছ হো শকতা । কোই মালুম নেহি ।

লেট তো বাড়তেও পারে ।

কুছ ভি হো শকতা । ইন্ডিয়ান রেলওয়ে হ্যায় না । লেট হোনা হি ইস্‌কা দস্তুর হ্যায় ।

এত স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনে শ্যামল নির্বিকার হওয়ার চেষ্টা করল ।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে মাসীমার সেই ভাসুরপোর বাড়িও কাঁকুড়গাছিতেই । গাড়ি মাসীমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে সেখানেই যাবে ! এরকম তো হতেই পারে, তাই না ? পৃথিবীতে কত অঘটনই তো ঘটে ! সেই যে সে একটা সত্য ঘটনার কথা কোথায় যেন পড়েছিল, অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়িয়ে কয়েকজন নাবিক ফুর্তি করতে নেমেছিল । সেখানে একটি সরল যুবতীর সঙ্গে এক নাবিকের প্রেম হল এবং তারা গির্জায় গিয়ে বিয়েও করে ফেলল ! তারপর নাবিকটি চলে গেল জাহাজে, তার আর কোনও পাত্তা নেই । মেয়েটি অপেক্ষা করে করে ধৈর্যহারা, কিন্তু বোকা মেয়েটা তার ঠিকানাটাও ভাল করে জানে না । শুধু জানে তার নাম জন, তার বাড়ি লন্ডনে । একদিন মেয়েটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল । অতি কষ্টে টাকা পয়সা জোগাড় করে সে একদিন টিকিট কেটে লন্ডনগামী জাহাজে উঠে পড়ল । লন্ডনের জাহাজঘাটায় নেমে সে হারা উদ্দেশ্যে 'জন ! জন !' বলে এগোচ্ছে । কী আশ্চর্য, ঠিক সেই সময়ে জনও আসছে উল্টো দিক থেকে । দুজনেই আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরল দুজনকে । ট্রুথ ইজ সামটাইমস স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন ।

আঙুলে গরম লাগায় সিগারেটের শেষ অংশটা দেয়ালের উপচে পড়া অ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে দিয়ে শ্যামল বলে, কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন ?

কলকাতা ! না, কলকাতায় আমার তেমন কোনও আস্তানা নেই । মাঝে মাঝে অফিসের কাজে আসি, হোটেলে থাকি ।

আত্মীয় স্বজন ?

কলকাতায় তেমন কেউ নেই । দূর সম্পর্কের দু'চারজন আছে ।

ছেলেটা সিগারেটটা তেমন করে খায়নি। দুটো একটা টান দিয়ে ফেলে দিল। শ্যামল আর একটা ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, আর চলবে?

না, থাক।

প্যাকেটটা বুক পকেটে রাখতে গিয়ে লাইটারটা টুকুস করে পড়ে গেল। ছ্যাত করে উঠল বুকটা। লাইটারটা তার দারুণ প্রিয়। এক বন্ধু হংকং থেকে এনে দিয়েছিল। একটু অসভ্য ব্যাপার আছে জিনিসটার গায়ে। চ্যাপ্টা ছিমছাম লাইটারটার গায়ে দুটো বিকিনি পরা সুন্দরীর ছবি। আপসাইড ডাউন করলেই বিকিনি অদৃশ্য হয়ে দুজনেই সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যায়। বকুল কয়েকবারই এটাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তোমার রুচিটা কী বলো তো! খুব রস পাও ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখে? টুকুস কিন্তু বড় হচ্ছে মনে রেখো। শ্যামল আজকাল লাইটার বকুলের সামনে পারতপক্ষে বের করে না। জনসমক্ষেও একটু লুকিয়েই রাখতে হয় জিনিসটা। কিন্তু লাইটারটা তার ভীষণ প্রিয়। খুব পাতলা, ছিমছাম, ভিতরে গ্যাস কতটা আছে তা দেখার জন্য উইন্ডো, বেশির ভাগ সময়ে এক স্ট্রোকেই জ্বলে। তাইওয়ান ফাইওয়ানের মতো দেশও আজকাল কত পারফেক্ট প্রোডাকশন করছে। উঠে আসছে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, এমন কি ইন্দোনেশিয়াও। কিন্তু ইন্ডিয়া কোথায়? এখনও ইন্ডিয়ায় ভদ্রগোছের ব্যবহারযোগ্য ইলেকট্রনিক লাইটার তৈরি হয় না, ভাবা যায়?

লাইটারটা কুড়িয়ে ট্রাউজারের গায়ে মুছে পকেটে ভরল শ্যামল।

আপনি দিল্লি-বেস্‌ড বাঙালি?

ছেলেটা মাথা নাড়ে, না।

দেন হোয়ার আর ইওর ফোকস? মানে আপনার নিয়ার রিলেটিভরা সব কোথায়?

ছেলেটা তার আকর্ষণীয় ঈষৎ ভাঙা কিন্তু স্বপ্নালু গলায় বলে, আমার তেমন কেউ নেই। আমি একটু লোনলি।

একদম একা?

একরকম তাই। আমি ওনলি চাইল্ড। মা-বাবা ডিসিসড।

বিয়ে করেননি?

না।

না-টা খুব কনফিডেন্স নিয়ে বলল না। একটু থেমে থেমে বলল, অনেক কথা ঠিক অফ হ্যান্ড বলা যায় না।

খুব সমবেদনার সঙ্গে শ্যামল বলে, তা তো বটেই। আই অ্যাম বিয়িং এ

নোজি পার্কার । ডোন্ট মাইন্ড ব্রাদার । আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

বিশ্বরূপ ।

আপনার নোজি কিন্তু একটু মেলাঙ্কলিক । তাই হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, কোনও মিসহ্যাপ হয়ে গেছে কিনা ।

মাত্র চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সী সুন্দর ছেলেটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, অনেকের কাছে এই বেঁচে থাকাটাই একটা মিসহ্যাপ ।

কামরার দরজাটা খুলে গেল । বকুল । রুষ্ট মুখ ।

এই, তুমি এখানে। বাচ্চাটাকে একা ফেলে এসেছো, আস্থা লোক তো !

শ্যামল তাড়াতাড়ি সিচুয়েশন সামাল দিতে গিয়ে বলে, আরে, এ হল বিশ্বরূপ । এ ব্রাইট বয় । একটা আলোচনা হচ্ছিল আমি তো টুকুনের পাশে স্যুটকেস খাড়া করে প্রোটেকশন দিয়ে এসেছি, দেখনি।

বকুল ঝড়াক করে দরজাটা ছেড়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেল রাগ করে ।

ছেলেটার ব্যথাতুর মুখে একটা ক্লিষ্ট হাসি ফুটল, বউদি রাগ করবেন বলেছিলাম ।

শ্যামল কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্পোর্টসম্যানের মতো বলল, ম্যারেজ হ্যাজ ইটস টোল । বউ তো রাগ করার জন্যই আছে । রাগ ছাড়া অন্য মুড খুব রেয়ার । আমি সিজন্‌ড হয়ে গেছি ।

ছেলেটা বেশ লম্বা । শ্যামলের চেয়েও ইঞ্চি দুয়েক । শ্যামল পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি । এ প্রায় ছ ফুট । চেহারাটা বেশ পেটানো । দেখতে ভাল । কিন্তু মুখখানায় একেবারে ছাই মাখানো যেন । সামথিং রং । ভেরি মাচ রং ।

খুব ঘুরলেন ? যেন কথা বলার ইচ্ছে নেই, তবু জোর করে বলার মতো বলল ছেলেটা ।

শ্যামল সিগারেট শেষ করে বলে, আমরা প্রতি বছরই এ সময়টায় বেরোই । গতবার সাউথ ইন্ডিয়া, তার আগেরবার রাজস্থান, তারও আগে কুলু মানালি । ঘোরাঘুরি এবার বন্ধ করতে হবে । যা অবস্থা । কাশ্মীরে লাশ পড়ছে, পঞ্জাবে লাশ পড়ছে, আরও হবে । ভয় হয়, সব জায়গাতেই না বেড়ানোতে কুলুপ পড়ে যায় । আচ্ছা, আপনি কি চাকরি করেন ? নাকি বিজনেস ?

চাকরি !

ওঃ হ্যাঁ, বলছিলেন বটে অফিসের কাজে কলকাতা যাচ্ছেন । দিল্লি বেস করে থাকা খুব ভাল সেন্ট্রাল জায়গা কি জানি কেন মশাই, আমার দিল্লি শহরটা বেশ লাগে ।

হ্যাঁ, ওপর থেকে খুবই সুন্দর ।

নিচু থেকে কি অন্যরকম ? নীচের দিল্লিও আছে নাকি ?

সব শহরেরই থাকে । ওপর থেকে একরকম, নীচের লেভেল থেকে অন্যরকম ।

তাও হয় নাকি ? দুটো দিল্লি !

বিশ্বরূপ মৃদু হেসে, দুটো কেন, বড় বড় শহরগুলোর ভিতরে অনেক লেভেল থাকে । যেখান থেকে যেমন দেখায় সেরকমই দেখে মানুষ । পলিটিক্যাল লেভেল, কালচারাল লেভেল, ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল, ক্রাইম লেভেল । আপনি যেটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন শহরটাকে সেই অ্যাঙ্গেল থেকেই বিচার করতে থাকবেন ।

ওয়েল বিশ্বরূপ, আপনার লেভেলটা কী ? পলিটিক্যাল না কালচারাল ?

ক্রাইম ।

অ্যাঁ ! তার মানে ?

আমি পুলিশে চাকরি করি ।

মাই গড ! আপনাকে আর যাই হোক, পুলিশ বলে কিছুতেই মনে হয় না । আই হ্যাভ নেভার সীন সাচ এ মেলাঙ্কলিক পুলিশম্যান । ওয়েল, ওয়েল, আই অ্যাম ড্যামড্ ।

ক্রাইমের লেভেল থেকে দিল্লি কিন্তু ততটা সুন্দর নয় ।

শ্যামল মাথা নেড়ে বলে, সে তো বটেই । আমি ওসব লেভেল টেভেল থেকে বলছি না । এমনিতে অ্যাপারেন্টলি দিল্লি চমৎকার শহর । অনেকে বলে লাইফ নেই, আড্ডা নেই, অ্যাজ ইফ ওটা একটা ভাইট্যাল ব্যাপার । বাঙালি যে আড্ডা দিয়ে দিয়ে শেষ হয়ে গেল সেটা কে দেখছে ?

বিশ্বরূপ ঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, আপনি ভিতরে যান । বোধহয় এতক্ষণে আপনাদের ডিনার সার্ভ করে দিয়েছে । দেরি হলে বউদি ফের রেগে যাবেন ।

ওঃ ইয়েস নতুন করে রাগবার কিছু নেই । উনি ইন ফ্যাক্ট রেগেই আছেন ।

বাথরুম ঘুরে দুজনেই ফিরে আসে কামরায় । শীতল নিস্তব্ধতা । অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে । রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি দুটো ঢাকা দেওয়া ট্রে সাজানো রয়েছে টেবিলে । সিটের এক পাশে দুটো বেডরোলও সাজানো রয়েছে । মাড়োয়ারিটি ব্যাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । বকুল একটা বাংলা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করছে । মুখটা থমথমে ।

গাড়িটা কি পাগল হয়ে গেল ? এত জোরে যাচ্ছে কেন ? শ্যামল সামান্য উদ্বেগ বোধ করল । একবার তাকাল বকুলের দিকে । ভারী অভদ্র বকুল । সে বিশ্বরূপকে ইনট্রোডিউস করে দিল, বকুল একটা হ্যালো গোছের কিছুও বলল না । অত রেগে যাওয়ার কী আছে ? এত ন্যাগিং হলে কি চলে ?

খাবে ? বইটা রেখে বকুল ঠাণ্ডা গলায় বলে ।

শ্যামল একটু গম্ভীর হয়ে বলে, খেতে পারি ।

হাত ধুয়ে এসো । বাস্কেটে সাবান আছে ।

জানি । বলে শ্যামল একটু গুম হয়ে সাবান নিয়ে হাত ধুয়ে এল ।

বিশ্বরূপ কিন্তু খাচ্ছে না । ফের জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে ।

মুর্গীর একটা ঠ্যাং তুলে গন্ধটা শুঁকে নিয়ে শ্যামল বলে, আপনি কি ডিনার সেরে এসেছেন ?

বিশ্বরূপ স্তিমিত গলায় বলে, হ্যাঁ ।

খাওয়ার সময় শ্যামলের একটা প্যাশন কাজ করে । এতটাই করে যে সে খেতে খেতে গল্প-গাছা বা টি ভি দেখা বা অন্যমনস্ক হওয়া পছন্দ করে না । সে খেতে ভীষণ ভালবাসে । ফলে পঁয়ত্রিশেই তার শরীরে বেশ মেদ জমে গেছে । পেটটায় বিশেষ রকমের । আগে তার কুকুরের মতো চিমসে-মারা পেট ছিল । বকুল আর তার মধ্যে একটা নীরবতার বলয় তৈরি হয়েছে তাদের দাম্পত্য জীবনে এটা খুবই হয় । যখন-তখন হয় এবং আবার একসময়ে সময়ে বলয়টা ভেঙেও যায় । মেয়েটা হওয়ার পর থেকেই এটা বেশী হয়েছে । মেয়েকে উপলক্ষ করে তাদের আজকাল বেশ লেগেও যায় ।

শ্যামল আর বকুল যখন খাচ্ছে তখন নাঙ্গা সিটের ওপর হাতে মাথা রেখে বিশ্বরূপ একসময়ে গড়িয়ে পড়েছে । খাওয়ার ঝোঁকে লক্ষ্য করেনি শ্যামল । খেয়ে আঁচিয়ে এসে সে বকুলকে চাপা গলায় বলে, মাসীমাকে নিতে হাওড়ায় গাড়ি আসবে । একবার বলে দেখবে নাকি গাড়িটা যদি আমাদের একটু পৌঁছে দেয় !

বকুল চুপ করে থেকে রাগের গলায় বলে, তুমিও তো বলতে পারতে ?

আহা, সবাই জানে আমার চেয়ে তুমি বেটার টকার ।

কাজের বেলায় আমি, না ।

প্লীজ ! অত রাতে পৌঁছে আমরা স্ট্র্যান্ডেড হয়ে যাবো । গাড়ি যখন মাসীমাকে নিতে আসছেই আমাদের ইজিলি পৌঁছে দিতে পারবে ।

বকুল সামান্য থমথমে মুখে বলে, আমি পারব না । তুমি যে কেন সামান্য

ব্যাপারেই এত টেনশনে ভোগো ? তোমাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল । একটা রাত হাওড়ায় বসে থাকলে কি হয় ? রাতটাও পুরো নয় । ভোর চারটে সাড়ে চারটেয় ট্যাক্সি চালু হয়ে যাবে । ম্যাক্সিমাম ঘণ্টা তিনেক বসে থাকতে হতে পারে, তাতে এমন কি অসুবিধে বলো তো !

টুকুসটার যে কষ্ট হবে ।

কিসের কষ্ট ? স্যুটকেস পেতে শুইয়ে রাখব, অঘোরে ঘুমোবে

মুখখানা তোম্বা করে শ্যামল বলে, তা অবশ্য ঠিক ।

যাও ওপরে উঠে শুয়ে পড়ো । তার আগে আমাদের বেডরোলটা পেতে দাও । কম্বলচাপা দিতে হবে, যা ঠাণ্ডা ছেড়েছে । ওদের একটু বলো না গো, ঠাণ্ডাটা একটু কমিয়ে দিতে !

বললেই কি আর দেবে ?

বলেই দেখ না ।

এত রাতে কি আর মেশিনের লোক জেগে বসে আছে ?

তুমি সব ব্যাপারেই বড্ড ফাঁড়া কাটো । ঘরের বাঘ, বাইরের বেড়াল । যাও তো, একটু হাঁক ডাক করো । পুরুষ মানুষকে একটু হাঁকডাক করতে হয় । মেনিমুখো হয়ে থাকলে চলে না ।

যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি ।

এই সব ছোটো খাটো প্রবলেম কখনোই মেটাতে পারে না শ্যামল । তার কপালটাই এরকম । বউ তাকে যত তাড়না করে ততই সে নার্ভাস হয়ে পড়ে, ততই গুবলেট হয়ে যায় সব কিছু । এই যেমন এখন শ্যামল করিডোর বা আশেপাশে, কাউকে পেল না । মেঝেতে একটা কাপড় পেতে দুটি লোক গুটিশুটি হয়ে ঘুমোচ্ছে । কন্ডাকটরও জায়গায় নেই । শূন্যকে তো আর কিছু বলা যায় না । শ্যামল অগত্যা ফিরে এল ।

কেউ নেই । কাকে বলব ?

ইস, এত ঠাণ্ডায় ঠিক সর্দি লেগে যাবে টুকুসের । ওর তো ঠাণ্ডা একদম সহ্য হয় না ।

ভাল করে কম্বলচাপা দিয়ে রাখো না । মনে করে নাও এটা শীতকাল ।

শীতকালের ঠাণ্ডা আর এয়ার কন্ডিশনারের ঠাণ্ডা মোটেই এক নয় । আর্টিফিসিয়াল ঠাণ্ডা শরীরের পক্ষে ভীষণ খারাপ, বিশেষ করে যাদের সর্দির ধাত আছে । তোমার দ্বারা কোনও কাজ হওয়ার নয় । আমি টুকুসকে নিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি বিছানাটা তাড়াতাড়ি করে দাও ।

ঠিক এই সময়ে বিষণ্ণ বিশ্বরূপ মৃদু স্বরে বলে, দাঁড়ান আমি ঠাণ্ডা কমানোর ব্যবস্থা করে আসছি ।

বলে উঠে গেল ।

দেখলে ! সবাই তোমার মতো নয় । তুমি নিজের জনের জন্য যা পারলে না, এ ছেলেটা পর হয়েও কেমন উঠে গেল ।

বিছানা পাততে পাততে শ্যামল বলে, তুমি ছেলেটার সঙ্গে কিন্তু বেশ অভদ্র ব্যবহার করেছো । আমি ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া সত্ত্বেও একটাও কথা বলোনি ।

বেশ করেছি । যা ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছিল ! সেইজন্যই তো উঠে মাসীমার কাছে গিয়েছিলাম ।

তাকাচ্ছিল ! ওয়েল, ওয়েল, দ্যাটস এ গুড সাইন ।

তোমার মুণ্ডু । এখন যাও তো, ওপরে ওঠো । পর্দাটা টেনে দাও ।

পায়জামা আর হাওয়াই শার্ট পরা একটা লোক এসে কিউবিকলের ভিতরে উকি দিয়ে বলে, ঠাণ্ডাটা কমিয়ে দিয়েছি স্যার । বুঝতে পারছেন ?

বকুল বলে, না তো । বেশ ঠাণ্ডাই লাগছে ।

আর দশ মিনিটের মধ্যেই টের পাবেন । না হলে বলবেন আমাকে আমি মেশিনের কাছেই থাকব ।

ঠাণ্ডাটা বাস্তবিকই একটু কম-কম লাগছিল শ্যামলের । একটু লজ্জাও করছিল । সে পারেনি । বিশ্বরূপ পারল ।

ছেলেটা ফিরে আসতেই শ্যামল বলে, থ্যাঙ্ক ইউ । আমি লোকটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না ।

মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছিল, তাই বুঝতে পারেননি ।

বকুল একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলে, আপনাকে উঠতে হল, লজ্জা করছে সেজন্য । আসলে আমার কর্তাটি একদম মুখচোরা মানুষ । আমিই ওকে চালিয়ে নিই ।

বুঝতে পারছি । আপনাদের আরও একটা প্রবলেম আছে বোধহয় । হাওড়া স্টেশনে বেশি রাতে পৌঁছনোর প্রবলেম ।

শ্যামল সোৎসাহে বলে, হ্যাঁ, বিগ প্রবলেম ।

বিশ্বরূপ মৃদু হেসে বলে, নো প্রবলেম । আমার জন্যও স্টেশনে একটা গাড়ি থাকবে । সেই গাড়িই পৌঁছে দেবে আপনাদের । নিশ্চিন্তে ঘুমোন ।

ভগবানে বিশ্বাস ছিল না শ্যামলের । এখন মনে হল, বলা যায় না, ওরকম

একটা কেউ থাকলেও থাকতে পারে। একটু একচোখো বটে, বড়লোকদের পিছনেই বেশি তেল খরচা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘোর নাস্তিককেও একটু খাতির টাতির দেখায়।

বারকয়েক থ্যাঙ্ক ইউ বলে বাঙ্কে উঠে পড়ল শ্যামল। এত নিশ্চিন্ত এত ভারহীন লাগছিল তার যে ঘুম আসতে চাইছে না। অথচ, 'কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম।' বাস্তবিকই নিঝুম। হঠাৎ একটু সচকিত হয়ে ওঠে সে, গাড়িটা কি বড্ড বেশি জোরে চলছে না। বড্ড বেশি দুলছে না! ব্রেক ট্রেক ফেল করেনি তো। এমনও তো হতে পারে যে, কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী ইনজিনে উঠে অ্যাট গান পয়েন্ট ড্রাইভারকে বাধ্য করছে গাড়ি এক নাগাড়ে চালিয়ে নিতে। এদেশে সবই হতে পারে। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

বাথরুম ঘুরে আসবে বলে বাঙ্ক থেকে নেমে সে দেখল, বকুল আর টুকুস নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওপরের বাঙ্কে মাড়োয়ারি, নীচের সিটে বিশ্বরূপ এবং আশে পাশে কেউ জেগে নেই। সে করিডোরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেল। ট্যাপ থেকে একটু জলও খেল।

এরপর ঘুমটা হল তার। লম্বা ঘুম। সকাল আটটা পর্যন্ত। তখনও পাটনা জংশন আসেনি। আসতে দেরি আছে। টুকুস শান্তভাবে বসে বিস্কুট খাচ্ছে। বকুল আধো-জাগা আধো-ঘুমে শুয়ে আছে তখনও। বিশ্বরূপ জানালার বাইরে তেমনি চেয়ে আছে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বোধহয় বাথরুমে।

শ্যামল ঘড়ি দেখে বলল, আরও লেট করেছে নাকি ট্রেন?

বিশ্বরূপ মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, করেছে।

কিন্তু দারুণ রান করছিল মাঝরাতে।

মোঘলসরাইয়ের আগে আটকে ছিল অনেকক্ষণ।

এঃ, তাহলে যা ভয় করছিলাম তাই হল।

কিসের ভয়?

মধ্যরাত্রির ভয়।

বিনা স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। কামরার আবছায়া থেকে করিডোরে বেরিয়ে আসে শ্যামল। হাতে পেস্ট লাগানো টুথ ব্রাশ, কাঁধে তোয়ালে। ডান দিকের দরজাটা খোলা। দরজার সামনে উবু হয়ে বসে একটা লোক দাঁতন করছে। আর দরজার ওপাশে হা হা করছে উদোম চাষের মাঠ, রোদে ঝলমল। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে হু হু করে। কী যে অপার্থিব সুন্দর লাগল এই পৃথিবীকে! মুগ্ধ হয়ে শ্যামল চেয়ে থাকে। গাছপালা, ক্ষেতখামার, কুটির,

রোদ, দিগন্ত সে কি অনেক দেখেনি ? তবু মাঝে মাঝে এরা সব এক বিশেষ বিন্যাসে এমন অপরূপ হয়ে যায়, যেন ম্যাজিক । আসলে তার মনটাও বোধহয় আজ ভাল আছে । কোনও টেনশন নেই । কিছুক্ষণের সম্মোহন কাটিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে গেল ।

সম্মোহন আরও কাটল যখন বেলা তিনটে নাগাদ ঝাঁঝা স্টেশনের আগে গাড়ি একদম চুপ মেরে গেল । গেল তো গেলই । নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু । এক ঘণ্টা বাদে অফ করে দেওয়া হল এয়ার কন্ডিশনার । শোনা গেল, সামনের লাইনে ফাটল । ট্রেন কখন ছাড়বে ঠিক নেই । কন্ডাকটর আর মেকানিকের সঙ্গে কিছু যাত্রী লড়ালড়ি করল বটে, কিন্তু কন্ডাকটর সাফ জবাব দিল, ট্রেন চালু না হলে এ সি চালানো যাবে না সাহেব । মেশিন বসে যাবে । সুতরাং বন্ধ কামরা গরম হতে লাগল । ভেপে উঠতে লাগল

বকুল বলল, কী হবে ?

হতাশ শ্যামল বলে, কী আর হবে ! সাফার করা ছাড়া আর কী উপায় আছে ?

কামরার গরম ভ্যাপসা ভাব সহ্য করতে না পেরে অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে । বিশ্বরূপ অনেকক্ষণ হল সিটে নেই । মাড়োয়ারিও নেই । শ্যামলও উঠল ।

কোথায় যাচ্ছো ? সিগারেট খেতে ?

আরে না । সিগারেটও শেষ হয়ে এল প্রায় । আর মোটে গোটা পাঁচেক আছে । আদ্রা বা পাটনায় কিনে নিলে হত । বাইরে গিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় দাঁড়াই ।

আচ্ছা স্বার্থপর লোক তো তুমি ! নিজে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াবে । আর আমরা !

এইভাবেই সূচনা হয় এবং লেগে যায় । বিবাহিত জীবনকে কি এখন ভয় পায় শ্যামল ? পায় বোধহয় । আবার বকুল ছাড়াও কি তার চলে ? প্লাসও আছে, মাইনাসও আছে । পাঁচ বছর বয়সী বিয়েটা শেষ অবধি টিকে থাকবে কিনা এ নিয়েও তার সন্দেহ আছে । মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে চলে যায় তাদের ঝগড়া যে শ্যামল সংসার-ত্যাগের কথা ভাবে, ডিভোর্সের কথা ভাবে । মেয়েটা হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের কিছু অবনতি হয়েছিল । তার পর থেকে ক্রমাবনতি ।

শ্যামল খুব ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বলে, তুমি নামতে চাও ? কিন্তু ট্রেন হঠাৎ

ছেড়ে দিলে!

মোটেই নামতে চাই না। তুমিও নামবে না। সকাল থেকে মেয়েটাকে আগলে বসে আছি। ওকে একটু রাখো, আমি শোবো। মাথা ধরেছে।

অগত্যা মেয়েকে কোলে নিয়ে শ্যামল বলে, একটু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি কি? নাকি তাতেও আপত্তি আছে?

গাড়ি থেকে নামবে না কিন্তু, খবর্দার।

আরে না।

করিডোরে এখন দুদিকেরই দরজা খোলা। চারদিকে খা খা করছে রোদ। প্রকৃতির দৃশ্য এখন আর তত সুন্দর নেই। রুক্ষ, গরম, ঘোলাটে, বাইরে অন্তত কয়েক শো লোক নেমে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। হকার ঘুরছে। শান্ত মেয়েটিকে কোলে নিয়ে শ্যামল দাঁড়িয়ে রইল। থেমে থাকা ট্রেনের মতো এমন অভিশাপ আর মানুষের জীবনে কীই বা আছে?

ওটা কী বাবা?

শ্যামল হঠাৎ দুর্দশার কথা ভুলে মেয়ের গালে নাক ডুবিয়ে দিল।

॥৩॥

মস্ত নিমগাছের ছায়ায় এখনও খাটিয়া পাতা। খাটিয়ায় আধময়লা সবুজ সস্তা একখানা চাদর বিছানো, একখানা বালিশ। খাটিয়ার মাথার দিকে পায়ার কাছে ঝকমকে পেতলের ঘটি, তাতে ঢাকনা দেওয়া। পীতাম্বর মিশ্র সুতরাং বাড়িতেই আছেন। রিক্সা থেকে নেমে কাঠের ফটক ঠেলে বাড়ির চত্বরে ঢুকেই অনুমানটা মজবুত হল অজিতের। পীতাম্বর মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস নিমগাছের ছায়া এবং নিমের হাওয়ার জোরেই সত্তরেও তাঁর স্বাস্থ্য এত ভাল।

স্বাস্থ্য কতটা ভাল এবং সক্ষম সেটা পরীক্ষা করতেই কি পীতাম্বর হঠাৎ মাত্র কয়েকমাস আগে ছাব্বিশ বছরের দুরন্ত এক দেহাতি যুবতীকে বিয়ে করে বসলেন? নাকি বিয়েটা আসলে এতদিন বাদে তাঁর "এক্স ওয়াইফ" ভজনাদেবীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই?

বেলা সাড়ে দশটাও বাজেনি, গরমের রোদে চারদিক যেন চিতাবাঘের মতো ওত পেতে আছে। বিহারের গ্রীষ্ম মানেই বাঘের থাবা। পীতাম্বর মিশ্রর বাড়িটা তেমন কিছু দেখনসই না হলেও এলাকা বিশাল। চারদিক মাটি আর ইটে গাঁথা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে মস্ত ইঁদারা দেখা যাচ্ছে।

ইঁদারার ওপর কপিকল লাগানো। সরু শেকলে বাঁধা বালতিতে মহেন্দ্র জল তুলছে।

অজিত একটু দূর থেকেই হাঁক দিল, মহিন্দর, মিশিরজী হ্যায় ?

জী সাব। বৈঠ যাইয়ে। লালুয়া, আরে এ লালুয়া, চারপাই লাগা রে।

পীতাম্বর মিশ্রর পারসোনালিটিকে কখনও সন্দেহ হয়নি অজিতের। তাঁর ঘরদোর এবং তাঁকেও যারা সামলে রাখে তারা কেবলমাত্র বেতনভুক চাকরবাকর নয়। এরা মিশ্রজীর ভক্ত এবং অনুগামীও বটে। মহেন্দ্র বোধহয় ত্রিশ বছরের ওপর পীতাম্বরের কাছে আছে। লালুয়াও আছে শিশুকাল থেকে। পীতাম্বরের কাছ থেকে এরা অর্থকরী দিক দিয়ে তেমন কিছু পায় না, অজিত জানে।

অনাথ শিশু লালুয়া এখন কিশোরটি হয়েছে। থ্যাবড়া নাকের নীচে গোঁফের সুস্পষ্ট আভাস, পুরু ঠোঁটের ফাঁকে তৃপ্তি এবং আনন্দময় একটা হাসি। চারপাইটা ছায়ায় পেতে দিয়ে খুশিয়াল গলায় বলে, বৈঠ যাইয়ে। অউর বিড়ি মত পিজিয়ে।

এ বাড়ির চৌহদ্দিতে ধূমপান নিষেধ। খৈনিও নয়। এ বাড়িতে চা বা অন্য কোনও নেশার দ্রব্যের প্রচলন নেই। পীতাম্বর নেশার ঘোর বিরোধী। অজিত দড়ির চারপাইতে বসে বলল, পানি তো পিলা রে।

পানি এবং পীতাম্বর প্রায় একসঙ্গেই এলেন। পরনে ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া গোছের জিনিস, তাতে পকেট আছে। পায়ে খড়ম। গামছাও থাকে কাঁধে, তবে এখন সেটা বালিশের আড়ালে রাখা আছে, দেখতে পেল অজিত। গত বাইশ বছরে পীতাম্বর তেমন পাল্টাননি। বাইশ বছর ধরে অজিত তাঁকে দেখে আসছে। তারও আগে থেকেই পীতাম্বর বোধহয় একইরকম থেকে গেছেন।

পীতাম্বর প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন, কলকাতায় ছাত্র আন্দোলন করেছেন এবং কিছুদিন চাকরিও। জলের মতো বাংলা বলতে পারেন। অজিত যেমন পারে হিন্দি বলতে। কিন্তু পীতাম্বর বোধহয় অজিতের হিন্দিকে তেমন বিশ্বাস করেন না, বরাবর অজিতের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন। অজিত যখন জল খাচ্ছিল তখন পীতাম্বর খাটিয়ায় বসে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখছিলেন।

আশা করি তুমি ইন্টারভিউ নিতে আসোনি!

অজিত একটু অবাক হয়ে বলে, ইন্টারভিউ ? না তো!

মজবুত দাঁত দেখিয়ে পীতাম্বর হাসলেন, আমি এখন নিঃশেষিত পানপাত্র।

কেউ আর পোঁছে না । তবে বিয়ে করার পর কিছু কাগজ কেস্থা হিসেবে সেটা ছেপেছে । তোমার মতলব কি ? ইজ ইট এ প্রফেশনাল ভিজিট ?

অজিত পীতাম্বরকে ভালই চেনে । যখন রাজনীতি করতেন তখনও রাজ্যসভায় মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত মন্তব্য করতেন বা ছড়া কাটতেন যে লোকে বলত ছিটিয়াল ।

তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়নি । তোমার চোখ দেখে মনে হয় লিভার ভাল কাজ করছে না । বোধহয় রাত জাগো ! আজকাল কি ড্রিংকও ধরেছো নাকি ?

না মিশিরজী । আপনি তো জানেন নিউ পাটনা টাইমস ছোটো কাগজ । ভাল চলছে না । রিট্রেনচমেন্ট তো হবেই, কাগজও উঠে যেতে পারে । আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি ।

তোমার এডিটর রঙ্গনাথ হচ্ছে একটি আস্ত পাঁঠা, বিক্রি বাড়াতে ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্টিং-এর নামে বদনাম ছড়াচ্ছে । ওতে কি কাগজ চলে ? এদেশে খবরের অভাব নেই, ঠিকমতো লিখতে পারলে কত খবর কুড়িয়ে আনা যায় । তোমরা শুধু বস্তাপচা রাজনীতি ছাপবে, তাতে হয় ? এদেশের রাজনীতি নিয়ে কারও কোনও মোহ আছে বলে মনে করো ? আমি তো করি না । আমি কিসের ওপর রিসার্চ করছি এখন জানো ?

কিসের ওপর ?

এ কে ফর্টি সেভেন । কালাশনিকভ । উজি । অনেক বই আনিয়েছি ।

অজিত একটু অবাক হয়ে বলে, রিসার্চ করছেন কেন ? এসব তো টেরোরিস্টদের অস্ত্রশস্ত্র

বটেই তো । উগ্রবাদীরাই তো ক্ষমতায় চলে আসছে । তোমার গভর্নমেন্টকে তো হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে উগ্রবাদীরা । এত কামান বন্দুক পুলিশ মিলিটারি লেলিয়ে কিছু করতে পারলে ? আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি উগ্রবাদীরা আরও বহুত খেল দেখাবে ।

অজিত অবাক হয়ে বলে, আপনি কি মনে করেন উগ্রবাদীরা পাওয়ারে আসবে ?

উগ্রবাদীরা আর অলরেডি ইন পাওয়ার । এখন তো তারাই সরকারকে ইচ্ছেমতো চালাচ্ছে । পঞ্জাব কাশ্মীর, অসম, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, খানিকটা বিহার, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কটা স্টেট হল অজিত ? সব জায়গায় উগ্রবাদীরা তোয়াজ আর খাতির পাচ্ছে । কিসের জোরে জানো ? এ কে ফর্টি সেভেন, কালাশনিকভ, উজি । এসব নিয়ে আমি পড়ছি এবং লিখছি । হাতে কলমেও

দেখছি ।

অজিত নড়েচড়ে বসে বলে, হাতে কলমে ?

পীতাম্বর তাঁর চিরকেলে চাপা হাসি হেসে বলেন, কাউকে, যদি না বলো তো বলতে পারি ।

আপনি কি কোনও অস্ত্র হাতে পেয়েছেন মিশিরজী ?

আলবাত । এসব কি শুধু থিওরেটিক্যাল নলেজ থেকে হয় নাকি ? দেখতে চাও ?

চাই ।

তাহলে এসো ।

পীতাম্বরের পিছু পিছু তাঁর বাড়ির পিছন দিককার একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল অজিত । একটা সুটকেস খুলে পীতাম্বর দেখালেন ভাঁজ করা খুলে রাখা একটা রাইফেল । খুবই আধুনিক জিনিস ।

পীতাম্বর বললেন, কয়েক সেকেণ্ডে অ্যাসেম্বল করা যায় । আমি রোজ প্র্যাকটিস করি । তবে দুঃখের বিষয় গুলি নেই । কয়েক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবো । তখন চাঁদমারি করব পিছনের বাগানে

পীতাম্বর কি পাগল হয়ে গেলেন ? অজিত এত অবাক হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না । তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, আপনার কি এর লাইসেন্স আছে মিশিরজী ?

পাগল ! এর লাইসেন্স সরকার কাউকে দেয় নাকি ? লাইসেন্সের প্রয়োজনই বা কি ? হাতে হাতে ঘুরছে । অ্যাভেলেবল এভরিহোয়্যার । তুমি যদি মিলিট্যান্ট হওয়ার ডিসিশন নাও তাহলে তোমার হাতেও এসে যাবে

অজিত একটু শিহরিত হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে কি উগ্রবাদীদের যোগাযোগ আছে ?

মিশিরজী তাঁর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে তাকে ঘরের বাইরে ঠেলে বের করে দরজায় তালা দিয়ে বললেন, আছে । তোমার নেই ?

না । আমার কি করে থাকবে ?

তাহলে তুমি কিসের রিপোর্টার ? ঘোড়ার ঘাস-কাটা রিপোর্টিং করো বলেই তোমাদের কাগজগুলো এত স্টেল । আমি অ্যাকটিভ পলিটিকস ছেড়ে দিয়েছি বলেই ধরে নিও না যে আমি পলিটিক্যালি ডেড । আই অ্যাম ভেরি মাচ ইন পলিটিকস । ভারতবর্ষের ভাবী পলিটিকস যেখানে তৈরি হচ্ছে আমি সেই গর্ভগৃহ আন্ডারগ্রাউন্ডের পলিটিকসকে এখন স্টাডি করছি । তুমি কি নাভার্স

হয়ে পড়লে অজিত ?

হ্যাঁ মিশিরজী । খুবই নার্ভাস । আপনি এসব কেন করছেন ?

সেটা আগেই বলেছি । তোমার মাথা ক্রিয়া করছে না বলে বুঝতে পারোনি। বাঙালি হয়ে উগ্রবাদের প্রসঙ্গে নার্ভাস হয়ে পড়া কি তোমাকে মানায় ? উগ্রবাদের জন্ম দিয়েছিল কে অজিত ? ব্রিটিশ আমলের কথা বাদ দাও, নকশাল মুভমেণ্টও কি ভুলে গেছ ? বাঙালি নকশালদের হাতে এই সব অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তারা দিশি বোমা, ভোজালি, চপার, কয়েকখানা পিস্তল আর পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাই করা পুরনো মডেলের কয়েকটা রাইফেল নিয়ে গোটা দেশ কাঁপিয়ে ছেড়েছিল, মনে নেই ? ভাবতে পারো ওরা এই সব সফিস্টিকেটেড অস্ত্র পেলে কী কাণ্ড করতে পারত ? পুরো পাওয়ার নিয়ে নিতে পারত হাতে। বাঙালি এখন নকশালি ছেড়েছে, কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে রেখে গেছে তার প্রভাব । নকশালরাই তো এই উগ্রবাদের গুরু এবং অগ্রপথিক । বাঙালি ছেড়েছে । ধরেছে বিহার, অন্ধ্র, কেরল । ধরেছে কাশ্মীর, পঞ্জাব, অসম, তামিলনাড়ু । আরও ছড়াবে । বহুৎ ছড়িয়ে যাবে । তোমাদের নপুংসক গদি আঁকড়ে থাকা আর কর্তাভজা রাজনীতির দিন শেষ হয়ে আসছে ।

পীতাম্বরের বাড়িটি নেহাত ছোটো নয় । অনেকগুলো ঘর । আসবাবের বাহুল্য নেই । আধুনিকতারও বালাই নেই । পীতাম্বর খুব সহজ সরল জীবন যাপন করতে ভালবাসেন । বাহুল্য পছন্দ করেন না । যে কটা কারণে পীতাম্বরকে এখনও গভীর শ্রদ্ধা করে অজিত তার একটা হল লোকটার এই সাদাসিধা জীবনযাপন ।

আমার মনে হচ্ছে অজিত, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাটিকে দেখার একটা আগ্রহ তোমার আছে । দেখতে চাও ?

অজিত অন্যমনস্ক ছিল । পীতাম্বর তাকে যথেষ্ট নার্ভাস করে দিয়েছেন । সে একটু চমকে উঠে বলল, না না, সেরকম কোনো—

আরে, লজ্জা পাচ্ছো কেন ? বি ফ্র্যাংক । তুমি তো জানো আমি ফ্র্যাংকনেস পছন্দ করি ।

আমি অন্য একটি দরকারে এসেছিলাম মিশিরজী । আমি বলতে এসেছিলাম নিউ পাটনা টাইমসের কোনও স্থায়িত্ব নেই । আপনি আমাকে এই চাকরিটা দিয়ে একসময়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে চাকরিটা থাকবে না । কাগজটা হয়তো উঠে যাবে ।

মিশিরজী অতিশয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, ওসব বস্তাপচা কাগজ রেখেই

বা লাভ কী অজিত ? তুলে দাও, না হলে রঙ্গনাথের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেরা চালাও । আর ভজনার কোষ্ঠী ও জাতক বিচারটা সবার আগে বাদ দিয়ে দেবে । জ্যোতিষি একটা মস্ত ধাপ্পাবাজি ।

অজিত একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, আপনি হয়তো ওঁর ওপর রেগে আছেন । কিন্তু নিউ পাটনা টাইমসের সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন হল, ভজনা দেবীর ফোরকাস্ট এবং জাতক বিচার ।

ভ্রূ কুঁচকে পীতাম্বর বলে, জানি । ভজনার কাছে এখন বহু ভি আই পি তাদের ভাগ্য জানতে আসে । অনেকে নাকি তাকে আজকাল মাতাজী বলেও ডাকে । খুব শিগগিরই হয়তো সে একটা স্পিরিচুয়াল লীডার হয়ে উঠবে । এই পোড়া দেশে এরকম ঘটাই তো স্বাভাবিক । তুমি বোধহয় তার কাছে যাতায়াত করো !

মিশিরজী, উনি আমাকে স্নেহ করেন । আমাদের কাগজে ওঁকে লিখতে রাজি করিয়েছিলাম আমিই । যতদিন উনি লিখবেন ততদিন আমি সেফ ।

পীতাম্বর হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হাসলেন, তাই বলো ! ভজনাকে তাহলে তুমিই ভিড়িয়েছো ওই কাগজে । এখন আমার কাছে আসার মতলবটা কী ? ভজনা যখন তোমার ফেবারে আছে তখন চিন্তা কিসের ?

কাগজটা রিভাইটালাইজ করতে হলে আপনাকেও আমাদের দরকার । আপনি একসময়ে দারুণ জার্নালিজম করেছেন ।

লেখাটেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি অজিত । লিখে কিছু লাভ নেই । যে-দেশে নিরক্ষরের হার এত বেশি সে দেশে কাগজে লিখে কোনও ফল হয় না । আমি যা বলতে চাই তা ওই নিরক্ষরদের জন্যই । আমি অন্য মিডিয়ামের কথা ভাবছি যা কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছোবে

মিশিরজী, সমস্যাটা আমার একার নয় । গোটা কাগজ এবং তার চল্লিশ পঞ্চাশজন কর্মচারীর । আপনি লিখতে শুরু করলে কাগজটা বোধহয় বেঁচে যাবে ।

কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছো । একে যে তেল-দেওয়া বলে তা জানো ?

জানি । আর এও জানি যে মানুষ সত্তর বছর বয়সে এ কে ফর্টি সেভেন নাড়াচাড়া করে সে তেলের তোয়াক্কা করে না ।

পীতাম্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি যা লিখব তা ছাপাতে পারবে ?

অজিত একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, আপনি এখন উগ্রবাদ নিয়েই বোধহয় লিখবেন ? তা-ই লিখবেন । ছাপব ।

ইট মে বি ভেরি এক্সপ্রেসিভ অ্যান্ড ডেনজারাস অ্যান্ড সিডিশাস । রঙ্গনাথ অ্যারেস্টও হয়ে যেতে পারে ।

রঙ্গনাথজীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু উনি এ ব্যাপারে খুব সাহসী । উনি আগেও দুবার গ্রেফতার হয়েছেন এবং আমাদের কাগজের বিরুদ্ধে অন্তত চারটে ডিফারমেশন কেস ঝুলছে ।

লেখা কিন্তু এডিট করতে পারবে না ।

পাগল ! আমার ঘাড়ে কটা মাথা ?

ঠিক আছে, তোমার মুখ চেয়ে লিখব । তুমি আমার ছেলের মতো । তোমার অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়, তবু স্নেহ জিনিসটা বোধহয় কোনও যুক্তিরই ধার ধারে না । আচ্ছা একটা কথা বলতে পারো, বাঙালিদের এরকম হাল হল কেন ?

কিরকম হাল মিশিরজী ?

কিছুদিন আগে পুরুলিয়ায় দুটো শিখ উগ্রবাদী ঢুকে পড়েছিল, মনে আছে ?

আছে ।

সংখ্যায় তারা মাত্রই দুজন । দুটো লোক সারা জেলায় দাপাদপি করে বেড়াল, মানুষ মারল, পুলিশ মারল । তাদের ভয়ে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে দেওয়ার মতো অবস্থা হল পুলিশের । ধেয়ে এল লালবাজার এবং বিরাট অপারেশনের আয়োজন হল । প্রায় বাঘ মারার মতো করে মারা হল তাদের । হোয়াট এ গ্রেট ফুলিশনেস । যেখানে দুজন উগ্রপন্থীকে ধরলে অনেক ইনফর্মেশন আদায় করা যেত, পাওয়া যেত অনেক গুপ্ত খবর সেখানে তাদের ধরার চেষ্টাই হল না । মেরে ফেলা হল । অথচ সে দুটো মানুষ তখন অবসন্ন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত । লড়াই করার ক্ষমতাও তাদের আর ছিল না । আর কিছুক্ষণ ঘিরে রাখলেই অজ্ঞান অবস্থায় তাদের ধরা যেত । কিন্তু বাঙালি পুলিশ এত ভয় খেয়ে গিয়েছিল যে, তারা সেই চেষ্টাই করেনি । আমি শুধু ভাবছি মাত্র দুটো লোক আর দুটো এ কে ফর্টি সেভেন যদি তোমাদের এই অবস্থা করতে পারে তাহলে পঞ্চাশ বা পাঁচশো উগ্রবাদী ঢুকে পড়লে তো তোমাদের সরকার গদি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। বাঙালিদের হল কি অজিত ? উগ্রবাদের আগরওয়ালাদের এই হাল কেন ?

মিশরজী, আপনি বড় উগ্রবাদের ভক্ত হয়ে পড়েছেন !

না রে বাচ্চা, আমি আরও বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছি এ কে ফর্টি সেভেনের । আমি রোজ অস্ত্রটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি । চীনের সবচেয়ে

সাকসেসফুল এক্সপোর্ট আইটেম । তার চেয়েও বড় কথা, এ কে ফর্টি সেভেনই এখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সম্মানিত জিনিস ।

অস্ত্রটা আপনাকে কে দিল ?

আছে আছে । তুমিও যদি চাও তো পাবে । কিছু টাকা খরচা করতে হবে । এই যা । নিমগাছের নীচে গিয়ে বোসো, আমি মিঠিয়াকে ডাকছি । সে বোধহয় গোসলখানায় আছে । আমার দ্বিতীয় পক্ষকে দেখে যাও, ভজনাকে গিয়ে বোলো কেমন দেখলে ।

লজ্জা পেয়ে অজিত বলে, কী যে বলেন মিশিরজী ।

নিমের ছায়ায় বসে লালুয়ার এনে-দেওয়া এক গেলাস ঘোল খেল অজিত । তারপর মিশিরজী এলেন, পিছনে সদ্যস্নাতা এক যুবতী । যুবতীই বটে । সারা অঙ্গে এমন উচ্চাবচ ব্যাপার যে তাকাতে লজ্জা করে ।

আরে আরে, নববধূর মতো মুখ নামিয়ে নিলে যে ! দেখ, ভাল করে দেখে নাও । ভজনাকে গিয়ে বোলো, আমার বয়স সত্তর আর আমার দ্বিতীয় পক্ষের বয়স তেইশ, তবু ওর কোনও অভিযোগ নেই । শী ইজ কনটেন্টেড । ইচ্ছে করলে তুমি ওকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো । তবে খবর্দার, পরকীয়া করার চেষ্টা কোরো না । জানোই তো, আমার এ কে ফর্টি সেভেন আছে ।

এটা সেই গ্রীষ্মকালের কথা । অজিত পাটনায় ফিরে পরদিনই ভজনা দেবীর বাড়িতে গেল । ভজনাকে সে মা বলে ডাকে । শুধু জ্যোতিষি করে কেউ যে এই ভাল আর্থিক অবস্থায় পৌঁছতে পারে তার ধারণাই ছিল না অজিতের । আগেও জ্যোতিষবিদ্যা চর্চা করতেন, ডিভোর্সের পর সেটা পেশা হিসেবে নিলেন । পাটনার এক গলিতে একখানা ঘর নিয়ে থাকতেন । এখন বাড়ি করেছেন দোতলা । গাড়িও কিনবেন । পীতাম্বর মিথ্যে বলেননি, অনেকেই আজকাল ভজনাকে মাতাজী বলে ডাকে । তার চেয়েও বড় কথা ভজনা দেবী এখন এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, নানা পর্যায়ে তাঁর প্রভাব ক্রমে বাড়ছে । বেশির ভাগ সময়েই লালপেড়ে গরদ পরে থাকেন, সিঁথিতে তেল সিঁদুর বহাল আছে । অজিতের কাছ থেকে বিবরণ শুনে বললেন, মিশিরজীর কাছে তুই হঠাৎ যেতে গেলি কেন ? লোকটা ভেবে নিল, আমিই তোকে পাঠিয়েছি ওর নতুন বউকে দেখে আসতে ।

সেরকমই ভাবলেন । কিন্তু আমাকে পাঠিয়েছিলেন রঙ্গনাথজী । পীতাম্বরের লেখা তো খুব ঝাল মশলাদার হয়, ইংরিজিটা লেখেনও চোস্ত । কাগজটা একটু হয়তো চলবে ।

বউটা কি ভাল ? যত্নআত্তি করে ?

সেটা কি করে বলব ? তবে মিশিরজী ভালই আছেন ।

লালুয়াটা কেমন আছে ?

ভাল মা । সব ভাল ।

ভাল হলেই ভাল । তবে একটা ফাঁড়া আছে মিশ্রজীর ।

এর বেশি কিছু আর ভজনা দেবী বলেননি । অজিতেরও আগ্রহ হয়নি জানবার ।

পুজোর আগে রঙ্গনাথজী ডেকে বললেন, অজিত, পীতাম্বরের কোনও খবর নেই । লেখাটা কী হল ? তুমি পাত্তা লাগাও ।

ঠিক আছে, চিঠি দিচ্ছি ।

আরে দূর । পীতাম্বর চিঠির জবাব দেওয়ার মতো ভদ্রলোক নাকি ? নিজে চলে যাও । ক্যাশ থেকে যাওয়া আসার ভাড়া তুলে নিয়ে যাও, আমি অ্যাকাউন্টান্টকে স্লিপ পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

ফের পীতাম্বরকে ধরাকরা করতে এল অজিত । এসেই বুঝল, সব ঠিকঠাক নেই । কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটেছে । সেটা এতই বেশি যে, ফটকে ঢোকবার আগেই বোঝা যায় । ফটকের কাছে লালুয়া দাঁড়িয়ে ছিল, অজিতকে দেখেই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল । অজিত কাছে এসে দেখল, ফটকে তালা আটকানো । দুটোই অস্বাভাবিক ঘটনা ।

অজিত বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, লালুয়া ! এ লালুয়া ! মহেন্দর ।

একটু বাদে লালুয়া বেরিয়ে এল । হাতে চাবি । মুখে হাসি নেই । ফটক খুলে অজিতকে ঢুকতে দিয়েই আবার তালা আটকাল ।

অজিত অবাক হয়ে বলে, তালা দিচ্ছিস কেন ?

ওইসাহি হুকুম হ্যায় ।

বাইরে নিমগাছের ছায়ায় তাকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল লালুয়া । বাইরে যে খুব কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, কিন্তু অজিত কেমন অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করল, বাড়িটায় কোনও প্রাণ নেই । কেন যেন থমথম করছে ।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে পীতাম্বর এলেন । অপেক্ষাকৃত ধীর চলন । মুখ একটু যেন বেশি গম্ভীর । কিংবা গাম্ভীর্যের চেয়ে বলা উচিত উদ্বিগ্ন । গ্রীষ্মকালে যা দেখে গিয়েছিল তার চেয়ে যেন এই কয়েকমাসে একটু বুড়িয়ে গেছেন ।

মিশিরজী, কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি তো । কী হবে ? পাল্টা বিস্ময় প্রকাশ করেন পীতাম্বর । কিন্তু

সেটা বিশ্বাসযোগ্য হল না। কৃত্রিম শোনাল।

আপনার শরীর খারাপ করেনি তো।

শরীর থাকলেই খারাপ-ভাল হয়। শুকনো গলায় বললেন পীতাম্বর আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে গলায়।

কে জানে বাবা কী। নতুন বউটা পালিয়ে টালিয়ে যায়নি তো! বিয়েটাই বোধহয় ভুল হয়েছিল। অজিত বিনীতভাবে লেখাটার কথা তুলতেই পীতাম্বর যেন চমকে ওঠেন, লেখা! কিসের লেখা!

ভুলে গেছেন মিশিরজী? আমাদের কাগজে লিখবেন বলেছিলেন যে। রঙ্গনাথজীর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। লেখা না পেলে আমার চাকরি থাকবে না।

পীতাম্বরের মুখে বিরক্তি এবং হতাশা যুগপৎ ফুটে উঠল। তেতো গলায় বললেন, লেখা টেখা আমার আসছে না বাপু। আমি খুব পরেসান আছি।

কেন মিশিরজী?

এত প্রশ্ন করো কেন অজিত? আমি এত প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

রাগলে পীতাম্বর একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন বটে, কিন্তু সহজে রাগবার পাত্রই উনি নন। সারাজীবন পলিটিক্স করে করে ঝানু হয়েছেন। গালমন্দ অপমান বিস্তর হজম করতে হয়েছে। রাগ উত্তেজনা ভাবাবেগ সবই অতিশয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। তাই এই সামান্য কথায় পীতাম্বরকে রেগে যেতে দেখে অজিত খুবই অবাক হল। এর পর কী বললে পীতাম্বর রাগ করবেন না সেটা বুঝতে না পেরে অজিত চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। হতবুদ্ধি।

পীতাম্বর নিজে থেকেই বললেন, আজ বরং যাও অজিত। পরে যোগাযোগ কোরো। আমার এখন একটু—

বলেই থেমে গেলেন।

অজিত খুব গাড়ল নয়। সাংবাদিকতা করে করে তার চোখ কিছু পেকেছে। হঠাৎ তার মনে হল, মুখ নয়, কিন্তু পীতাম্বরের চোখ তাকে কিছু বলতে চাইছে। সে স্থির চোখে পীতাম্বরকে নজর করতে করতে বলল, মিশিরজী, আমি আপনার অতিথি। অন্তত একটু জলও তো পেতে পারি!

জল। ওঃ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এ লালুয়া—

লালুয়া নয়, খুব ধীর পায়ে পায়জামা আর গেঞ্জি পরা একটা বিশাল চেহারার যুবক সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পেয়ারা গাছটার নিচু ডালে হাতের ভর রেখে দাঁড়াল। ছোকরাকে জন্মে দেখেনি অজিত।

লোকটি কে মিশরজী ?

পীতাম্বর খুব দ্রুত বললেন, আত্মীয় হয় । আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের ।

পীতাম্বর জীবনে মিথ্যে কথা বলেছেন খুবই কম হয়তো বা একটিও বলেননি । এই মিথ্যেটা বলতে তাই বোধহয় তাঁর মুখ ব্যথাতুর হয়ে উঠল । আগন্তুকটি কদাচ মিঠিয়ার আত্মীয় হতে পারে না । মিঠিয়া দেহাতী গেঁয়ো যুবতী, এ ছোকরার চোখে মুখে শিক্ষা ও আভিজাত্যের ছাপ আছে ।

হঠাৎ পীতাম্বর বলে উঠলেন, যা দেখতে পাচ্ছো না তা কল্পনা করে নিও না অজিত । প্লীজ !

কথাটার মানে অজিত বুঝতে পারল না । আলটপকা একথাটা পীতাম্বর বলছেন কেন ? তবে সে ফের স্পষ্টভাবে টের পেল, পীতাম্বরের মুখ এক কথা বলছে, কিন্তু চোখ অন্য কিছু বলতে চাইছে ।

অজিত খুব ভীতু নয় । সে মাফিয়া লিডার থেকে শুরু করে খুনে লুচ্চা বদমাস বিস্তর ঘেঁটেছে চাকরির সুবাদে । সে হঠাৎ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে, ছোটে মাতাজীর আত্মীয়ের সঙ্গে কি পরিচয় হতে পারে না মিশিরজী ?

পীতাম্বর হঠাৎ সচকিত হলেন, পরিচয় ! ওঃ হ্যাঁ, কেন নয় ?

পীতাম্বরের অস্বস্তি লক্ষ করে হঠাৎ অজিত লোকটার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, নমস্তে জী, আইয়ে না, বৈঠিয়ে ইহা পর ।

লোকটা খুব অবাক হল । তবে এল । বেশ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পদক্ষেপ । বেশ অহংকারী উচ্চশির গেরামভারী হাবভাব । মুখে হাসি টাসি নেই । চারপাইয়ের ওপর সাবধানে বসে পলকহীন চোখে অজিতের দিকে চেয়ে রইল । জরিপ করছে । হিসেব করছে

অজিতের একটা ইনটুইশন আছে খুনী দেখলেই সে চিনতে পারে । কখনও ভুল হয় না । খুনীর চোখে একটা আলগা চকচকে ভাব থাকবেই । সবাই বুঝতে পারে না, অজিত পারে । সে স্পষ্টই বুঝে নিল, এ লোকটা খুনী । পীতাম্বরের বাড়িতে এর জায়গা হওয়ার কথাই নয় । পীতাম্বরের বাড়ির জীবনযাত্রার একটা প্যাটার্ন আছে, তাতে এ ভীষণ বেমানান ।

তার চেয়েও বড় কথা, মুখটা অজিতের চেনা আবছা হলেও চেনা । কোনও ফটোগ্রাফে সে এই মুখটা দেখেছে ।

পীতাম্বর গুম মেরে গেছেন ।

অজিত তরল গলায় হিন্দিতে বলে, আপনি মিশিরজীর শ্বশুরবাড়ির মেহেমান শুনলাম । আমি অজিত, সামান্য সাংবাদিক ।

লোকটা বিবেকানন্দের মতো বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দুর্দান্ত গমগমে গলায় বলে, ইহা ক্যা কাম হ্যায় ?

অজিত মৃদু হেসে বলে মিশিরজীকা সাথ কুছ্ কাম হ্যায়

লোকটা অপমানজনক গলায় প্রায় ধমকে উঠল, তো ওহি কর লিজিয়ে ।

পীতাম্বরের অস্বস্তি এর পরে বেড়ে গেল । অজিত সংকেতটা বুঝতে পারছে কিন্তু পীতাম্বরের চোখ কী বলছে বা বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারল না । শুধু আন্দাজ করল পীতাম্বর সুখে নেই, সোয়াস্তিতে নেই, পীতাম্বর ভয় পেয়েছেন, চাপের মধ্যে আছেন ।

অজিত উঠল, স্বাভাবিক গলায় বলল, আজ চলি মিশিরজী আমাদের লেখাটার কথা মনে রাখবেন । সপ্তাহে একটা । পার আর্টিকেল আমরা দুশো টাকা করে দেবো

ভেবে দেখব । এখন যাও । ঠিকমতো কাম কাজ করো । হুঁশিয়ারসে । রঙ্গনাথকে বোলো আমরা ভাল আছি । ভজনাকেও বোলো ।

পীতাম্বরের পুরো কথাটাকেই কেন সংকেতবাক্য বলে মনে হল অজিতের ?

যখন চলে আসছিল তখন শুনতে পেল, লোকটা পীতাম্বরকে জিজ্ঞেস করছে, হু ইজ হি ?

লাইক মাই সন । পীতাম্বর বললেন ।

পাটনায় ফিরে অজিত সোজা অফিসে চলে গেল । তখন অনেক রাত । নাইট শিফ্ট চলছে । অজিত তার কাগজ এবং অন্যান্য কাগজের পুরনো ফাইল নিয়ে বসল বেয়ারা হবিবুরকে বলল, টেররিস্টদের ফটোর ফাইলটা বের করে আনো ।

প্রায় সারা রাত ফাইল ঘাঁটল অজিত । ভোরের দিকে একটা ফটোগ্রাফ খুঁজে বের করল । পিছনে একটা ট্যাগ লাগানো । বেশ বড় ট্যাগ । সুরেন্দ্র ওরফে হরদিক সিং ওরফে বুক্কা ওরফে নাম সিং ... অনেক নাম । সাসপেকটেড কিলার অফ খুনের তালিকাটাও বেশ বড় । ট্রেনড ইন কানাডা । সঙ্গে সবসময়ে দুজন বা তিনজন সঙ্গী থাকবেই । চার বছর আগে দিল্লিতে ছিল, একবার গ্রেফতার হয়, কিন্তু প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে যায় । সবসময়ে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও থেমে থাকে না । প্রপার আইডেন্টিফিকেশনের জন্য দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রানচের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।

সকাল আটটায় টেলেক্স করল অজিত । কি হবে কে জানে !

তারপর ফোন করল ভজনা দেবীকে, মাতাজী, পীতাম্বর সাহেবের সত্যিই

ফাঁড়া ।
ভজনা দেবী শান্ত গলাতেই বলেন, কী হয়েছে রে ?

আপনি অনেক ভি আই পিকে চেনেন মাতাজী । আপনি বললে তাড়াতাড়ি কাজ হবে । মিশিরজী বিপন্ন । নিজের বাড়িতেই উনি একজন উগ্রবাদীর প্রতিভূ হয়ে আছেন ।

কী যা তা বলছিস রে পাগলা ?

ঠিকই বলছি । অজিত সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে গেল ।

ভজনা দেবী একটু চুপ করে থেকে বলেন, তোকে তো বলেইছি ওর ফাঁড়া আছে ।

এখন জ্যোতিষ ছাড়ুন মাতাজী । মবিলাইজ অল রিসোর্সেস ।

আমার কি সত্যিই কিছু করা উচিত ?

সেটা আপনার ধর্মই আপনাকে বলে দেবে । তিনি তো আপনার হাজব্যান্ড । ডিভোর্স পীতাম্বর করলেও আপনি তা মানেননি মাতাজী । আপনি সিঁদুর পরেন ।

তুই তো আমাকে মা ডাকিস । এখন মাতাজী ডাকছিস কেন ?

উঃ মা, এখন এই বিপদের মধ্যে ওসব প্রশ্ন কেন ?

ভজনা দেবী আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, কেন যে তুই আবার আমাকে ওর ব্যাপারে জড়াতে চাইছিস ! হ্যাঁ রে, তোর কোনও ভুল হচ্ছে না তো ! লোকটা হয়তো সত্যিই ওর শ্বশুরবাড়ির লোক ।

না মা, আমি লোক চিনি এ হচ্ছে, সুরেন্দ্র বা সুরিন্দর । ব্যাড নেম ইন পুলিশ রেকর্ড ।

তুই একটা কাজ করবি অজিত ?

কি কাজ ?

আর একবার ওখানে যা ।

গিয়ে ?

ভাল করে বুঝে আয় । নইলে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে পরে লজ্জায় পড়ে যেতে হতে পারে ।

ঠিক আছে মা, যাবো । কিন্তু আপনি ইতিমধ্যে বসে থাকবেন না কিন্তু । কিছু হয়ে যেতে পারে ।

তুই আগে যা তো ! কিন্তু খুব সাবধান ।

অজিত গিয়েছিল । আর গিয়েছিল বলেই স্কুপ খবরটা দিতে পেরেছিল

একমাত্র নিউ পাটনা টাইম্‌স । পীতাম্বর, তার যুবতী বউ, দুজন কাজের লোক অটোমেটিক রাইফেলের গুলিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে ছিল বিশাল বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় । পীতাম্বরের লাশ পড়ে ছিল তাঁর প্রিয় নিম গাছের ছায়ায় । তাঁর সত্তর বছরের মজবুত শরীর —যা নিয়ে চাপা অহংকারও ছিল তাঁর—প্রায় দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল কোমরের কাছ বরাবর । নিউ পাটনা টাইমস-এর সব কপি বিক্রি হয়ে গেল চোখের পলকে । ঝোড়ো কাকের মতো চেহারায় অজিত যখন পাটনায় ফিরে অফিসে এল তখন রঙ্গনাথ তার পিঠ চাপড়ে একশো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন ।

অজিত ভ্রূক্ষেপও করল না । টেলেক্সে আর একটা মেসেজ পাঠাল দিল্লিতে । তিনজন উগ্রবাদী পীতাম্বরকে সপরিবারে খতম করে রাত বারোটার ডাউন দানাপুর এক্সপ্রেস ধরেছে । লোকাল পুলিশ খবর নিয়েছে, তাদের কলকাতার টিকিট ছিল ।

বিস্বাদ মুখে, খিদে-তেষ্টা-ঘুমহারা অজিত ভজনা দেবীকে ফোন করল, মা, সরি ।

একটু চাপা ধরা গলায় ভজনা দেবী বললেন, আমি ভবিতব্য মানি ।

আমারই ভুল, লোকাল পুলিশকে আমারই অ্যালার্ট করে আসা উচিত ছিল ।

কিছু লাভ হত না । পুলিশও এদের ভয় পায় । হয়তো পুলিশের আরও কিছু লোক মারা যেত । লালুয়াটাকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম । আর মহেন্দ্র—সেও তো কত ছেলেবেলায় আমার কাছে এসেছিল ।

আপনার ওকে ডিভোর্স দেওয়া উচিত হয়নি মা । আপনি থাকলে এটা হতে পারত না ।

কে বলল ? যা হওয়ার ঠিকই হত । আমরা কি সব কিছু খণ্ডন করতে পারি ।

মা, আপনি বড় ভাগ্যবাদী ।

আমার বিজ্ঞান তাই বলে । কি করব বল !

পীতাম্বরের জন্য শোক—সে তো আছেই অজিতের । কিন্তু এ ঘটনার পিছনে স্টোরিটা কি ? পীতাম্বর তাকে চোখ দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলেন । ওই অসম সাহসী লোকটিও মুখ খুলতে সাহস পাননি । পীতাম্বরকে চেনে অজিত, তিনি মৃত্যুভীত ছিলেন না । কিন্তু ব্যক্তিগত মৃত্যুকে অনেক কাপুরুষও ভয় পায় না, ভয় পায় প্রিয় বা আশ্রিতজনের মৃত্যুকে । পীতাম্বরের ভয়ও কি

তাই ছিল ? মিঠিয়া, লালুয়া, মহেন্দ্র এদের বাঁচানোর জন্যই কি তিনি মুখ বন্ধ রেখেছিলেন ? সেটাই সম্ভব । পীতাম্বর সবসময়েই বলতেন, আই লাভ মাই ফোকস চেনা জানা মানুষ, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, দলের লোক বা অনুগামী সকলকেই তিনি সবসময়ে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন ।

স্থানীয় পুলিশ অজিতের কাছে মুখ খুলল অনায়াসেই তার কারণ ঘটনাটা বেশ বড় ধরনের এবং তারা যথেষ্ট ভীত । এক ইনসপেকটর বললেন, ফোর মার্ডারস ইয়েস । বাট থ্যাঙ্ক গড দে আর আউট অফ আওয়ার হেয়ার ।

এ কথা কেন বলছেন ?

আরে ভাই, ওদের ট্যাকল করার মতো কী আছে আমাদের বলুন তো । ওই তো গাদা বন্দুকের মতো আদ্যিকালের সব ভারী বন্দুক, আর এরাটিক রিভলবার । আর ওদের কাছে সফিস্টিকেটেড এ কে ফর্টিসেভেন আর সাব মেশিনগান, যা দিয়ে আমাদের এখানকার পুরো পুলিশ ফোর্সটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় । এদের সঙ্গে লড়ার জন্য কী দিয়েছে আমাদের গভর্নমেন্ট ! এনি ট্রেনিং ? দু চার দিন লেফট রাইট করে ছেড়ে দিলেই হয়ে গেল ? ওদের দেখুন, প্রত্যেকে কম্যান্ডো ট্রেনিং নিয়ে আসছে পাকিস্তান বা চীন থেকে । বিদেশেও ট্রেন আপ করা হচ্ছে । ফুল মিলিটারি ট্রেনিং ! আমাদের এক্স মিলিটারি মেনরাও ওদের ভিতরে রয়েছে । আমরা সিভিলিয়ানদের ট্যাকল করতে পারি, মব ভায়োলেন্স-এর মোকাবিলায় যেতে পারি, গুণ্ডাবাজি সামলাতে পারি বাট নট দিস টাইপ অফ অ্যাডভারসারিজ ।

একটা কথা বলবেন ?

কী কথা ?

রিগার্ডিং পীতাম্বর মিশ্রজীর ইয়ং ওয়াইফ । ওয়াজ সী রেপড ?

মাই গড ! নো স্যার । আমরা ও অ্যাঙ্গেলটা খুব ভাল করে দেখেছি । মিলিটান্টরা এ কাজ বড় একটা করে না । মে বি দে হ্যাভ সাম আইডিয়ালস । তবে মার্ডারের তিন-চার দিন আগে আশে পাশের দুটো গ্রামীণ ব্যাঙ্ক লুটপাট এবং মার্ডার হয়েছে লাখ খানেকের মতো টাকা গেছে । দুটো ব্যাঙ্কেই আমরা এনকোয়ারি করেছি । কেউ মুখ খুলছে না । উল্টোপাল্টা বলছে । অ্যাবসোলিউটলি টেরোরাইজড । এখন বুঝতে পারছি পীতাম্বর মিশ্রজীর মার্ডারার আর ব্যাঙ্ক ডাকাত একই দল

তারা কজন ?

তিনজন ?

টাকার অ্যাঙ্গেলটার কথা মনে ছিল না অজিতের । সে এরপর পীতাম্বরের ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নিল । গত সপ্তাহে পীতাম্বর তাঁর চারটে মোটা টাকার ফিকসড ডিপোজিট ম্যাচুরিটির অনেক আগেই ভাঙিয়ে নিয়েছেন এবং তুলে নিয়েছেন সেভিংস অ্যাকাউন্টের প্রায় সব টাকা । সব মিলিয়ে লাখ দেড়েক তো হবেই ।

মুংলি পীতাম্বরের তিনটে মোষের জন্য ঘাস কেটে এনে দিত । আর রতুয়া আসত খেউরি করতে । পীতাম্বরের খানাতল্লাসে তারা প্রথমটায় ভয় পেয়ে মুখ বুজে থাকলেও পরে যা জানাল তা হল, প্রায় এক মাস হল তিনটে গুন্ডা ধরনের লোক পীতাম্বরের বাসায় থানা গাড়ে । প্রথমটায় কিছু বোঝা যায়নি । পিছনের বাগানে পীতাম্বর ওদের সঙ্গে কয়েকদিন বন্দুক নিয়ে চাঁদমারি করেছিলেন । তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল । হঠাৎ একদিন ফটকে তালা পড়ে গেল । বাড়ি থেকে কেউ বেরোত না । মুংলি ঘাসের বোঝা নিয়ে গেলে ফটকের ওপর দিয়ে ভিতরে ফেলতে হত, লালুয়া তুলে নিয়ে যেত । রতুয়া অবশ্য ভিতরে ঢুকে খেউরি করে আসত, তবে সবসময়ে লক্ষ করত আশেপাশে কেউ না কেউ মোতায়েন আছেই !

তবে বাজারহাট করত কে ?

ওই তিনজনেরই একজন । আর কেউ বাড়ির বাইরে আসত না । পীতাম্বরজী অবশ্য কয়েকবার বেরিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে ওদের কেউ থাকত !

তোরা পুলিশে খবর দিসনি কেন ?

বাপ রে ! জানে মেরে দিত বাবু ! ওসব বহুৎ খতরনাক আদমি ।

পুলিশের অনুমতি নিয়ে একদিন-পীতাম্বরের বাড়িতে ঢুকল অজিত । দুজন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, তাদেরই একজন বাড়ির দরজার তালা খুলে দিয়ে সাবধান করে দিল, জিনিসপত্রে হাত দেবেন না ।

পিছনের ঘরটায় সেই ছোট সুটকেসটা খুঁজে দেখল অজিত । পাবে বলে আশা করেনি । পেলও না । বিপ্লবীর অস্ত্র হাতে পেয়েও পীতাম্বর নিজেকে বাঁচাতে পারেননি, অস্ত্রটাও যোগ্য হাতে ফিরে গেছে । পীতাম্বরের লেখাপড়ার টেবিলটা খুঁজল অজিত । ফুলস্ক্যাপ কাগজের দেড়খানা লেখা পৃষ্ঠা পেল মনে হল, তাদের কাগজের জন্যই লিখতে শুরু করেছিলেন পীতাম্বর । এগোতে পারেননি । অজিত দেড়খানা পৃষ্ঠা চুরি করল অম্লান বদনে ।

পাটনায় এসে সে পীতাম্বর মার্ডার কেস-এর ওপর সংগৃহীত তথ্যাবলী সহ স্টোরি খাড়া করল । মুখপাত্র হিসেবে রইল পীতাম্বরের অসম্পূর্ণ লেখাটা ।

পর পর কয়েকদিন ধরে বেরোল রঙ্গদার কাহিনীটি ।

নিউ পাটনা টাইমস ডুবতে ডুবতেও যেন প্রবল বিক্রমে ভেসে উঠতে লাগল । রাতারাতি সার্কুলেশন বেড়ে গেল দশ হাজার । রঙ্গনাথের মুখে হাসি । অথচ লোকটা একসময়ে পীতাম্বরের বন্ধু ছিল । এখন পীতাম্বর এঁর কাছে শুধু একটা গরম খবর মাত্র । আর কিছু নয় । পীতাম্বরের খুনের খবর স্কুপ করতে পারায় এ লোকটা দারুণ খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।

অজিত শিউরে উঠে ভাবে, আমিও কি ওরকম হয়ে যাবো ? ওরকম হৃদয়হীন, স্বার্থপর ?

রঙ্গনাথ একদিন তাকে ডেকে বললেন, শোনো অজিত, নিউ পাটনা টাইমসের একটা হিন্দি এডিশন বের করার পারমিশন চেয়ে আমি অনেক আগেই একটা দরখাস্ত করেছিলাম । পারমিশনটা এসে গেছে । বাজার গরম থাকতে থাকতেই আমি হিন্দি এডিশনটা বের করতে চাই গেট রেডি ফর মোর ওয়ার্ক ।

উইথ মোর পে স্যার ?

রঙ্গনাথ ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, তারপর হাসলেনও, অফ কোর্স । তোমাকে ওভার অল ইনচার্জ করে দিচ্ছি । দুটো কাগজই দেখবে ।

পীতাম্বর বরাবর তার উপকারই করে এসেছেন । পুত্রবৎ দেখতেন অজিতকে । মৃত্যুর ভিতর দিয়েও শেষ উপকারটাই করে গেলেন বোধহয় । অজিতের চোখ ঝাপসা হয়ে এল আবেগে ।

পাটনার আই বি কালিকাপ্রসাদের সঙ্গে অজিতের খাতির অনেক দিনের । আগাগোড়া যোগাযোগ । কালিকা একদিন বলল, তুই ভাবতে পারিস, সুরিন্দর —শুধু সুরিন্দরের জন্যই একটা আলাদা সেল আছে স্পেশাল ব্রাঞ্চে ? চারটে মোস্ট এফিসিয়েন্ট অফিসার দিনরাত মনিটর করছে ওর অ্যাকটিভিটি । সারা ভারতবর্ষে যেখানে সুরিন্দরের গন্ধ পায় সেখানেই ছুটে যাচ্ছে ওরা । ওদের সন্দেহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পঞ্জাব থেকে আসাম সারা দেশে একটা সন্ত্রাসের ঢেউ তুলে দিচ্ছে ওই একটা লোক । ওকে ধরতে পারলে—অবশ্য ধরা কথাটা নিতান্তই কথার কথা—আসলে মারতে পারলে সরকার হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে ।

॥ চার ॥

বিশু ! ওঠ, ওঠ । খাবি না ? ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে যে বাবা ! আয় আমি খাইয়ে দিই !

বিশু চমকে উঠল । তারপর ধীরে চোখ খুলল বিশ্বরূপ । মা নেই, বাবা নেই, দাদু নেই, কেউ নেই । কেউ কোথাও নেই । মাঝে মাঝে এক অচেনা জগতের মধ্যে জেগে ওঠে বিশ্বরূপ । এরা কারা ? এ কোথায় এল সে ?

রাত বারোটার কাছাকাছি । ট্রেন এখনও বর্ধমানে পৌঁছোয়নি । ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ধৈর্যহারা যাত্রীরা গা ছেড়ে দিয়েছে । জল ফুরিয়েছে, খাবার নেই । শুধু ক্লান্তি আছে, আর বিরক্তি, আর রাগ । নিষ্ফল রাগ । উল্টো দিকের স্বামী আর স্ত্রীতে স্বাভাবিক বনিবনা নেই, ট্রেনের গর্দিশে মেজাজ আরও বিগড়ে গেছে । অন্তত চারবার চাপা ঝগড়া হয়েছে দুজনের এখন কথা বন্ধ । ভদ্রলোক বাঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন । ভদ্রমহিলা নীচের সিটে মেয়ের পাশে শোওয়া, তবে ঘুমোচ্ছেন কিনা বলা শক্ত । একটু আগে বিশ্বরূপ দেখেছে, ভদ্রমহিলা তাকে চোরা চোখে লক্ষ করছেন । বেশ সুন্দরী, তবে বিলম্বিত ট্রেনের বিরক্তিকর এই যাত্রায় সৌন্দর্যটা ধরে রাখতে পারছেন না ।

কামরায় এখন কোনও কথাবার্তা নেই । কথাও ফুরিয়েছে বোধহয় । ট্রেন আট ঘণ্টার ওপর লেট । স্টেশনে পৌঁছেও অনেকে বাড়ি যেতে পারবে না । খাবার পাবে না । লটবহর নিয়ে বসে থাকতে হবে প্ল্যাটফর্মে । বেশির ভাগ লোকেরই আর নতুন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই । প্রতিবাদ নেই । প্রতিকার নেই । তারা অগত্যা ঢুলছে । তবু এরা ঘরে ফিরবে, যখনই হোক । ট্রেন লেট হওয়া ছাড়া আর তেমন কোনও বিপদ হবে না এদের

বিশ্বরূপ বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল ছিটোল । এক ঝলক নিজের সিক্ত বিষণ্ণ মুখখানার দিকে তাকাল । লোকে বলে এ মেলাঙ্কলিক ফেস । কেউ কেউ আড়ালে তাকে উইপিং অফিসার বলে উল্লেখ করে । নিজের মুখে কিছুই খুঁজে পায় না বিশ্বরূপ । তার কেবল একটা কথাই মনে হয়, সে এক সাজানো মানুষ সে প্রতিপক্ষের উদ্যত অস্ত্রের সামনে এগিয়ে দেওয়া খড়ের পুতুল । সে এক অন্তহীন ক্যাসেট, যাতে অন্তহীন ক্রস একজামিনেশন, অন্তহীন জেরা, অন্তহীন তথ্যাবলী রেকর্ড করা হয় । সে এক বিবেকহীন ভাড়াটে খুনী । মাস-মাইনের বিনিময়ে সে ফর ল অ্যান্ড অর্ডার অস্ত্র প্রয়োগ করে । তার নিশ্চিন্ত ঘুম বলে কিছু নেই, কানের কাছে ফোন রেখে পোশাক পরা অবস্থায় সে

উৎকর্ণ হয়ে ঝিমোয় মাত্র । ফোন বাজলেই ছুটতে হয় এখানে সেখানে । রোবটের মতো দীর্ঘ রিপোর্ট টাইপ করে ফাইলবন্দী করতে হয় তাকে । মাঝে মাঝে একত্র হলে তারা চারজন ক্লান্ত অফিসার চুপচাপ বসে থাকে । কথা আসে না । ভাব আসে না । পারস্পরিক সিগারেট বিনিময় পর্যন্ত ভুলে যায় তারা ।

অ্যাসাইনড টু কিল ! নাকি অ্যাসাইনড টু বি কিলড ! কে জানে কি । তবে বিশ্বরূপ জানে সে গুপ্তঘাতকের প্রিয় টার্গেট । কে আগে কাকে দেখতে পাবে তা ঈশ্বর জানেন । ঈশ্বর জানেন কে আগে গুলিটা চালাবে । ঈশ্বর জানেন কার টিপ আসল মুহূর্তে থাকবে কতটা নির্ভুল ।

গৃহস্থদের কি হিংসা করে বিশ্বরূপ ? একটু করে । ওরা বেশ নিজেদের নিয়ে মেতে আছে । এই যে শ্যামল, তার সুন্দরী স্ত্রী বকুল, শিশু মেয়ে—ট্রেন লেট হওয়া ছাড়া, বাড়ি পৌঁছোনো ছাড়া এদের কোনও সমস্যাই নেই । এদের চলার পথে কেউ এদের জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করছে না ।

বিশ্বরূপ সিটে ফিরে এল । বকুল উঠে বসল উল্টোদিকের সিটে । নিজের চুল ঠিক করতে করতে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, এত রাতে আপনি কোথায় গিয়ে উঠবেন ?

বিশ্বরূপ সামান্য অবাক হয়ে বলে, আমি ! ওঃ । আমার জন্য কোনও হোটেলে একটা রুম বুক করা আছে ।

হোটেলে কেন ? কলকাতায় আপনার কোনও আত্মীয় নেই ?

না ।

আত্মীয়রা সব কোথায় ? দিল্লিতে বুঝি !

না । আমার তেমন আত্মীয় বলতে কেউ নেই ।

শ্বশুবাড়ির আত্মীয় তো আছে !

বিশ্বরূপ সামান্য হাসল, আমার বউ বা শ্বশুরবাড়িও নেই ।

আপনার তো সবই নেই দেখছি । বলে একটু হাসল, তাহলে আছেটা কি ?

স্মৃতি আছে । আর আছে কাজ ।

ভাইবোন ছিল না আপনার ?

না । আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ।

বকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, খুব আদরের ছিলেন বুঝি ! এখন তো যত্ন করার কেউ নেই, কষ্ট হয় না ?

না । কষ্ট কেন হবে ?

আমি তো বারো বছর বয়স অবধি মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলাম। তখন আদরটাকে মাঝে মাঝে অত্যাচার বলে মনে হত। গুচ্ছের খাবার গিলতে হত জোর করে, গাদা গাদা জামা কাপড় খেলনায় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসত, একটু অসুখ হলেই দুজন তিনজন ডাক্তার চলে আসত, ওষুধ খেয়ে খেয়ে ড্রাগ-অ্যাকশন হয়ে আমার নরমাল স্বাস্থ্যই নষ্ট হতে বসেছিল। প্রাইভেট পড়ানোর জন্য তিনজন মাস্টারমশাই আর দুজন দিদিমণি ছিলেন। গানের স্কুলে যেতে হত, ব্যায়ামের স্কুলে যেতে হত, আঁকা শিখতে যেতে হত। একা আমাকে যে কত কিছু করতে চেয়েছিল আমার মা আর বাবা। বারো বছর যখন আমার বয়স তখন হঠাৎ আমার দুটি যমজ ভাইবোন হয়। ওরা হওয়ার পর আমার ওপর থেকে অ্যাটেনশন সরে গিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আপনারও কি সেরকম ছিল?

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে স্মিতমুখে বলে, না। আমরা ছিলাম গরিব রিফিউজি। বনগাঁর কাছে একটা গাঁয়ে থাকতাম। আদরটা ঠিক আপনার মতো টের পাইনি। তবে—

থেমে গেল বিশ্বরূপ। বললে এ মেয়েটা বুঝবে না। সে কি করে বলবে যে, তাকে আদর করত শরতের নীল আকাশ, দিগন্ত থেকে ছুটে আসা বাতাস, রাতের নক্ষত্র, মাঠের ঘাস, জ্যোৎস্না রাতের পরী। তাকে আদর করত জোনাকি পোকা, ঝিঁঝির ডাক, কালো পিঁপড়ে। তখন ভগবান ছিল। মা ছিল। দাদু ছিল। বাবা ছিল। রুকুদি ছিল।

সেই গাঁয়ে কেউ নেই এখন?

না। কেউ নেই।

বাড়িটা?

ঠোঁট উল্টে বিশ্বরূপ বলে, সামান্য টিনের ঘর। হয়তো উড়ে পুড়ে গেছে। আমি আর যাই না।

কেন যান না? শত হলেও দেশ তো! আমাদেরও যশোরের কোথায় যেন দেশ ছিল। মা-বাবা সারাক্ষণ দেশের কথাই বলে। আমি জন্মাই কলকাতায়। দেশ নেই বলে খুব খারাপ লাগে।

কেন, কলকাতাই তো আপনার দেশ!

মোটেই না। কলকাতাকে কক্ষনো দেশ বলে মনে হয় না।

কেন মনে হয় না? কলকাতার কী দোষ?

কি জানি কেন। থাকতেই ভাল লাগে না। এ যেন অন্যের শহর। আমরা

কেমন যেন ভাড়াটে ভাড়াটে হয়ে আছি।

বিশ্বরূপ অর্থহীন ফ্যাকাসে হাসি হাসল।

মাটির গন্ধ না থাকলে কি কোনও জায়গা আপন হয়, বলুন? আমার খুব ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে থাকতে। মাটির ঘর করব, বেশ বড় একটা বাগান থাকবে, তাতে অনেক গাছপালা। আমার গাছপালার ভীষণ শখ। আমার হাজব্যান্ডকে কত বলি, ও শুনে কেবল চটে যায়। বলে, দূর দূর, গাঁয়ে আজকাল ভীষণ পলিটিকস, থাকতে পারবে না। কত বুঝিয়ে বলি যে, আমরা তো সবসময় থাকতে যাচ্ছি না, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব। কতই বা খরচ হবে গাঁয়ে মেটে বাড়ি করতে? ও বলে, ও বাবা, না থাকলে সব বেদখল হয়ে যাবে। আচ্ছা আপনাদের গ্রামটা কেমন ছিল?

বিশ্বরূপ ব্যথাতুর মুখে শূন্যের দিকে চেয়ে ছিল। অবশ্য সামনে শূন্য বলে কিছুই নেই। একটা আবদ্ধ কামরায় লটবহর, মানুষজন। তবু হঠাৎ কামরাটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখ থেকে। সামনে জলভরা বর্ষার মাঠ। সেদিন বাড়িতে রান্নাই হয়নি। এক পেট খিদে নিয়ে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছিল বিশু। তার তিনটে নৌকোর কোনওটাই শেষ অবধি সোজা হয়ে ভেসে রইল না। কেতরে পাশ ফিরে রইল। তারপর ঝমঝম বৃষ্টিতে ডুবেই গেল হয়তো। বর্ষার মাঠের ধারে একটু ভাঙা জমিতে কাকের মতো ভিজতে ভিজতে বসে রইল বিশু। পেটের খিদে থেকে রাগ উঠে আসছে মাথায়। এই বৃষ্টিতে কাগজের নৌকো কি ভাসে? ভাসে না, বিশু জানে। কিন্তু কেন রাগ হচ্ছিল? রাগের চোটে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল তিড়িং করে। তারপর আর কি করে? রেগে গিয়ে সে কি করে পৃথিবীকে জানান দেবে তার রাগ? সে হঠাৎ দুই হাত ক্ষিপ্তের মতো ওপরে তুলে জলে নেমে শুধুই লাফাতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, কেন! কেন! কেন এরকম হবে? কেন সবসময়ে এরকম হবে? উদ্দাম সেই নৃত্যের না ছিল মাথা না ছিল মুণ্ডু। লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে কেমন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল তার মাথা, চোখ আবছা হয়ে আসছিল বৃষ্টির জলে আর অশ্রুতে। রাতে স্বপ্নের ভিতরে তার তিনটে নৌকোই ফিরে এল সাজ বদল করে। পালতোলা মস্ত কাঠের নৌকো তরতর করে উজিয়ে আসছিল তার কাছে।

বিশুর ভগবান ছিল। বিশ্বরূপের নেই।

বিশ্বরূপ তার ঈষৎ ভাঙা ধীর কণ্ঠস্বরে বলে, কেমন আর ছিল। আর পাঁচটা গাঁয়ের মতোই। খুব গরিব গাঁ। কিছুই তেমন ছিল না সেখানে। বন্যা হত, খরা হত, চাষে পোকা লাগত। বর্ষাকালটা ছিল আকালের ঋতু। কতদিন

খাওয়া জোটেনি আমাদের ।

আহা রে। পথের পাঁচালী পড়তে পড়তে আমি তো কত কাঁদি কী সাঙ্ঘাতিক লেখা, না ? কী ভীষণ গরিব ছিল ওরা ।

মৃদু একটু হাসল বিশ্বরূপ । কিছু বলল না । এ মহিলা রোমান্টিক । এঁর এখনও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই হয়নি ।

আপনি পুলিশ কেন হলেন বলুন তো ? অন্য চাকরি জুটল না ?

বিশ্বরূপ একটু হাসে, আপনার কি পুলিশের ওপর রাগ আছে ?

না, তা নয় । পুলিশকে তো আমাদের ভীষণ দরকার হয় । তবে চাকরিটা কি ভাল ? একটু কেমন যেন, না ?

বোধহয় । তবে আমার এটাই জুটেছিল । চাকরি বাছাবাছি করার উপায় তো ছিল না । তখন বড্ড খিদে পেত ।

আমার হ্যাজব্যান্ড বলছিল আপনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন ।

পুলিশের চাকরিতেও মেধার দরকার হয় ।

যাঃ । পুলিশের চাকরি তো চোর-ডাকাত ধরা । আর কি ? আর ট্র্যাফিক কন্ট্রোল, আর বোধহয় মব ভায়োলেন্স আটকানো । এসবের জন্য মেধার আবার কী দরকার মশাই ?

বেঁচে থাকতে গেলেও মেধার দরকার হয় । নইলে মরতে হয় । একটু শক্ত কাজ ।

আপনাকে দেখে কিন্তু একটুও পুলিশ মনে হয় না । বরং ভাল লোক বলে মনে হয় ।

বিশ্বরূপ কখনও জোরে হাসে না । এখনও হাসল না । স্মিত মুখে বলল, পুলিশ তাহলে ভাল লোক নয় ।

অপ্রতিভ বকুল বলে, ঠিক তা বলিনি । চাকরিটা একটু রাফ গোছের তো । একটু র' । তাই না ? আপনাকে যেন মানায় না ।

বিশ্বরূপ নিজের করতলের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বোধহয় ঠিকই বলেছেন আপনি ।

রাগ করলেন না তো !

রাগ ! না । রাগ আমার খুব কম হয় ।

খুন টুন করেননি তো । মানে, পুলিশকে তো অনেক সময় দুষ্টু লোককে গুলিটুলি করতে হয় ।

বিশ্বরূপ একথাটারও জবাব দেয় না ।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বকুল বলে, তার মানে করেছেন। উঃ, কি করে যে একজনকে আর একজন খুন করে, তা সে হোক না চোর বা ডাকাত।

বিশ্বরূপ মৃদু মৃদু হেসে বলে, আপনার মেয়েকে আপনি খুব ভালবাসেন তো।

ও বাবা, ওকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না আজকাল। আমার দিন রাত্তির তো ওই ভরে রাখে।

ধরুন আপনার মেয়েকে যদি কেউ কিডন্যাপ করে আর মেরে ফেলার ভয় দেখাতে থাকে?

বকুল স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে বিশ্বরূপের দিকে। তারপর হঠাৎ বলে, বুঝেছি। পুলিশ কেন খুন করে কিংবা আপনি কেন খুন করেন সেটাই বোঝাচ্ছেন তো।

বোঝা মোটেই শক্ত নয়। তবে ওসব নিয়ে না ভাবাই ভাল। আপনাদের জীবন অন্যরকম।

আর আপনারটা?

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বুঝতে পারি না। আমি হলাম খড়ের পুতুল। কে যেন চালায় আড়াল থেকে।

আপনি কিরকম পুলিশ? বাবু-পুলিশ না কেজো-পুলিশ?

দু রকম আছে নাকি?

ওর এক বন্ধু আছে। লালবাজারে। সে কোনও অ্যাকশন ট্যাকশন করেনি কখনও। ভাল তবলা বাজায় আর বই পড়ে। সে বলে সে নাকি বাবু-পুলিশ। আপনি?

আমি কেজো। বিশেষ ধরনের কেজো।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ?

আপনি অনেক জানেন দেখছি। হ্যাঁ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

আপনার কাজটা বোধহয় বিপজ্জনক, তাই না?

ইট ডিপেন্ডস। বর্ধমান এসে গেল কিন্তু। জল টল লাগবে?

আপনি আজ তিনবার আমাদের ওয়াটার বট্‌ল ভরে দিয়েছেন। ছিঃ ছিঃ, যা লজ্জা করেছে আমার? আমার হাজব্যান্ডটি একদম স্মার্ট নয় যে। লেখাপড়া-জানা, মায়ের আদুরে ছেলে।

মেয়েটির বয়স তার মতোই হবে, অনুমান করল বিশ্বরূপ। পঁচিশ-ছাব্বিশ। আদুরে এও কম নয়।

আপনার রান্না কে করে দেয় ?

লোক আছে । মাইনে-করা লোক ।

বিশ্বাসী ?

পুলিশকে সবাই একটু সমঝে চলে ।

ওঃ, তাও তো বটে । ভুলেই গিয়েছিলাম । পুজোর মাসখানেক আগে আমাদের একটা কাজের মেয়ে সব চুরি করে পালিয়ে গেল । পাশের ফ্ল্যাটের ঝি এনে দিয়েছিল দেশ থেকে । খাওয়া-পরার লোক । বেশ কাজেরও ছিল । পালাল । পাশের বাড়ির ঝিটাও কাজ ছেড়ে দিয়েছে এ ঘটনার আগেই । ওদের গাঁয়ের নামটা অবধি ভুলে গেছি । পাঁচ ভরি সোনা, ঘড়ি, জামা-কাপড়, অনেক বাসন আর আমার কিছু কসমেটিকস । পুলিশ কিছু করতে পারল না । বলল, অজ্ঞাতকুলশীলকে রাখা ঠিক হয়নি, লোক রাখতে হলে আগে থানায় এনে নামধাম এন্ট্রি করে রাখতে হয় । তাই নাকি ?

হবে হয়তো ।

আপনার বাড়িতে তো চুরির বা ডাকাতির কোনও ভয় নেই, না ?

বিশ্বরূপ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তার চেয়েও বেশি ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে । সত্যিই জল বা চা কিছু চাই না তো !

না । জল আছে । এখন শুধু চাই বাড়ি ফিরে নিজের ঘরদোর আর নরম বিছানা । কটায় পৌঁছোবো বলুন তো !

রাত দেড়টা নাগাদ ।

আপনার গাড়ি সত্যিই থাকবে তো ! নাকি রাত বেশি হলে ফিরে যাবে ?

থাকবে । চিন্তা করবেন না ।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে আপনার তো হোটেলে ফিরতে আরও রাত হবে । আমাদের ফ্ল্যাটটা কিন্তু বেশ বড়, তিনটে বেডরুম । আপনি ইচ্ছে করলেই থাকতে পারেন ।

বিশ্বরূপ মাথা নাড়ে, আপনি বাড়ি ফিরছেন, কিন্তু আমি বাড়ি ফিরছি না । গন্তব্যটাই জানি না এখনও । হোটেলের কথা বলেছিলাম বলে ভাববেন না সেখানেই যাবো । হয়তো যাওয়া হবেই না ।

আপনি কি কোন মিশনে যাচ্ছেন ? অন ডিউটি ?

হ্যাঁ । অল ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সারভিস ।

আপনি যাকে বিয়ে করবেন সে বেচারার ভারী দুর্ভোগ আছে কপালে ।

বিশ্বরূপ মাথাটা কোলে আর একটু নামিয়ে নিল ।

সরলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক পার্টিতে। অন্য মেয়েদের মতো ঝলমলে নয়, বরং সিরিয়াস এবং চুপচাপ। কে যে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আজ আর তা কিছুতেই মনে পড়ে না। সব পার্টিতেই কিছু উটকো লোক আসে, স্মার্ট-রসিক-বাকচতুর এবং শিকড়হীন। ওরকমই কেউ হবে। আলাপ সামান্য, কিন্তু খুব গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল সরলা।

ওই চোখ দুটো তার পিছু নিয়েছিল সেদিন থেকে। তিন দিন বাদে ফোন এল মেয়েটির, তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

তখনই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল তার। কেননা সে মেয়েটিকে নিজের ফোন নম্বর দেয়নি। হয়তো সন্দেহ হয়েছিল, সেটা দাঁড়ায়নি, আবেগে ভেসে গিয়েছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরেও তো ফুটো ছিল!

সরলা কুঁয়ারি নিজের পরিচয় দিয়েছিল দিল্লির মেয়ে বলে। মা বাবা নেই। এক পিসির কাছে মানুষ। পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বিএ পড়ছে দিল্লির কলেজে। দেখা হল প্রগতি ময়দানের এক একজিবিশনে। তারপর দেখা হতে লাগল। সরলা হাসে কম, কথা কম, শুধু গভীরভাবে তাকায়। সেটাই ওর কথা।

এক মাস মাত্র সময় নিল তারা। তারপর বিয়ে করে ফেলল।

বিশ্বরূপের জীবনে এই বিয়ের চেয়ে ভাল ঘটনা আর কিছুই ঘটেনি। সরলা বুদ্ধিমতী, কাজে চটপটে, সেবায় সিদ্ধহস্ত। যত রাতেই ফিরুক বিশ্বরূপ, গরম কফি পেয়েছে সঠিক মাপের চিনি ও দুধসহ। ঝরঝরে ভাত রাঁধতে পারত সরলা, জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতে পারত। ঘর সাজাতে ভালবাসত। কখনও ঝগড়া বিবাদ করেনি।

মাত্র তিন মাস সেই অপরিমেয় গার্হস্থ্যের সুখ স্থায়ী ছিল। একদিন অফিসে কাজে করছে, হঠাৎ মালহোত্রা এসে বলল, বিশু, বাড়ি যাও। ব্যাড নিউজ।

বিশ্বরূপ চমকে উঠে বলে, ইজ শী ডেড?

না, তার চেয়ে খারাপ। শী ইজ আন্ডার অ্যারেস্ট।

বিশ্বরূপের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, অ্যারেস্ট! কী বলছো?

বাড়ি যাও। দে আর ওয়েটিং।

হু দি হেল?

পুলিশ।

বাড়ি ফিরে দেখে, সরলাকে তখনও নিয়ে যায়নি। থানার ও সি এবং কয়েকজন পুলিশ অফিসার গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করছেন। শোয়ার ঘরে কড়া

পাহারায় নতমুখী সরলা ।

কী হয়েছে ?

শী ওয়াজ ইন আওয়ার লিস্ট ।

হোয়াট লিস্ট ।

স্যার, এ মেয়েটির সঙ্গে সুরিন্দরের গ্রুপের কানেকশন আছে । ওপেন অ্যান্ড শাট কেস । আপনি ফাইল ঘাঁটলেই দেখতে পাবেন । ফরগেট দা ম্যারেজ স্যার । ইট ওয়াজ এ কনসপিরেসি টু পাম্প আউট ইনফরমেশনস ফ্রম ইউ ।

বিশ্বরূপ চেঁচাতে গিয়েও হঠাৎ স্থিতধী হয়ে গেল । শান্ত হল । তার মস্তিষ্ক কাজ করতে লাগল হঠাৎ । বাধা দিল না । পুলিশ সরলাকে নিয়ে গেল ।

পরদিন সুপিরিয়র ডেকে পাঠালেন বিশ্বরূপকে । গম্ভীর মুখ । প্রশ্ন করলেন, একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার কি করে এতটা ইডিয়ট হতে পারে বিশ ?

সারা রাত ঘুমোয়নি বিশ্বরূপ । মুখ সাদা, শরীরে জ্বোরো ভাব । কথা বলতে পারল না ।

শী ওয়াজ অন দি লিস্ট । মাত্র এক মাসের পরিচয়ে মেয়েটাকে তুলে নিলে ঘরে ? তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি আনিয়েছি, দেখছি চারজন সিভিলিয়ান তাতে সই করেছে সাক্ষী হিসেবে । যদি একজনও কলিগকে ডাকতে বিয়েতে তাহলেও হয়তো আটকানো যেত ।

আমি বিয়ের পর একটা পার্টি দিয়েছিলাম । তাতে কলিগরা ছিল স্যার । তারা তখন সরলাকে দেখেছে ।

সুপিরিয়র একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, কী দেখেছে বিশ ? তোমার বউ সেদিন বিউটি পারলারে গিয়ে হেভি মেক-আপ নেয়, আইব্রো বদলায়, লিপ-লাইন বদলে ফেলে, টায়রা, নাকছাবি, নাকের গয়না, উইগ সবই সে ব্যবহার করেছিল । তুমি প্রেমে অন্ধ হয়ে লক্ষ করোনি ।

বিশ্বরূপ মাথা নত করেছিল ।

হেল অফ এ ম্যারেজ !

বিশ্বরূপের তখন নিজেকে পরাস্ত, বিধ্বস্ত, নিঃশেষ বলে মনে হয়েছিল ।

তারপর চলল জেরা আর জেরা । পুলিশ হেফাজতে অন্তহীন জেরা, মনস্তাত্ত্বিক চাপ আর ভয় । ওরা দুদিনের মধ্যে সরলাকে ভেঙে ফেলল । গলগল করে বেরিয়ে এল তথ্য । তারপর আরও তথ্য । তারপর ধীরে ধীরে অসংলগ্ন কথাবার্তা । তারপর প্রলাপ ।

বিশ্বরূপ তাকে জেরা করার অনুমতি চেয়েছিল । সুপিরিয়র বলেছেন, বেটার

নট । ওর আর কিছু বলার নেই ।

একবার যদি দেখা করি ।

বেটার নট । ফরগেট ইট লাইক এ ব্যাড ড্রিম ।

কতখানি ভালবাসা ছিল সরলার, আর কতটাই বা অভিনয় সেটা মেপে দেখা হল না বিশ্বরূপের । সন্ত্রাসবাদীরা ওর কাছ থেকে কতটুকু জেনেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই বিশ্বরূপের । ওদের অনেক চ্যানেল আছে । সব খবরই পৌঁছে যায় ।

শুধু মালহোত্রা একদিন বলল, সুপিরিয়র একটা গাধা ।

কেন বলো তো ।

মেয়েটাকে অ্যারেস্ট করার মানেই হয় না ।

বিশ্বরূপ চমকে উঠে বলে, তার মানে ? ইজ শী ক্লিন ?

আরে না ভাই, ক্লিন নয় । তবে আমরা ওকে তোমার বউ হিসেবে আরও এফিসিয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারতাম । কাউন্টার এসপিওনেজে । ও আমাদের ভাইটাল কানেকশন হয়ে উঠতে পারত । এরা যে কেন সবসময়ে হাল্লা মাচিয়ে কাজ বিলা করে দেয় কে জানে ! তুমি কখনও ওর হ্যান্ডব্যাগ বা জিনিসপত্র দেখেছো খুঁজে ?

না তো !

শী হ্যাড এ গান । সবুজ স্যুটকেসটার তলায় পাওয়া গেছে ।

বিশ্বরূপ শিহরিত হল ।

আশ্চর্যের বিষয় সরলা অ্যারেস্ট হওয়ার পর ওর আত্মীয়স্বজন কেউ এগিয়ে এল না । ওর যে পিসিকে আবছা চিনত বিশ্বরূপ সেও অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় । বাস্তবিকই গোটা ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মতোই অলীক মনে হতে লাগল ।

একটা মেন্টাল হোম-এ পুলিশ হেফাজতে এখনও বেঁচে আছে সরলা । তবে সম্পূর্ণ উন্মাদ । চেঁচায়, কাঁদে, হাসে । বিশ্বরূপ কখনও তার সঙ্গে আর দেখা করেনি । তিন মাসের একটা সুখকর স্মৃতিকে কি বিসর্জন দিতে পারে সে ? তার সুপিরিয়র বলেছিলেন, ফরগেট ইট লাইক এ ব্যাড ড্রিম । কথাটার কোনও যুক্তি নেই । এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সুখ-দুঃখের স্থিতি কী ? ওই তিন মাস যদি অভিনয়ও করে থাকে সরলা তাতেই বা কি ক্ষতি ? ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রী, বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে কি এরকম অভিনয় মাঝে মাঝেই করে না ? মানুষে মানুষে অবিরল অনাবিল ভালবাসা বলে কি কিছু আছে ? কাজেই

বিশ্বরূপ তার বিপজ্জনক, অস্থায়ী এই জীবনে পদ্মপত্রে জলের মতো ওই টলটল করা তিনটে মাসের সুখ তার ভিতরে বন্দী করে রেখেছে। ওপরওয়ালার আদেশ সত্ত্বেও ভোলেনি। উন্মাদিনী সরলার কাছেও যায়নি ওই একই কারণে, মহার্ঘ তিন মাসের সৌন্দর্য ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

বিশ্বরূপ বকুলের দিকে চেয়ে তার ধীর গম্ভীর গলায় বলে, ঠিকই বলেছেন আপনি। আমাদের বউ হতে যদি কেউ রাজিও হয় তবে তার কপালে বিস্তর দুঃখ জমা আছে।

গাড়ি বর্ধমান ছাড়ল। বকুল তার গলার হারখানা ঠোঁটে নিয়ে একটু খেলা করে। মানুষ কখন যে কী করে তার ঠিক নেই। একটু চাপা হাসির ভাব আছে মুখে। বলল, তবু কেউ হয়তো সব জেনেই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। তেমন মেয়েও কি আর নেই। আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল একজন জঙ্গি পাইলট বা মিলিটারি অফিসারকে বিয়ে করি।

মানুষের প্রফেশনটা খুব বড় কথা নয়।

তবে কোনটা বড় কথা? মানুষটা? ওসব হল দার্শনিক কথা। আজকাল সবাই প্রফেশনটারই দাম দেয়। তবে আমি কিন্তু কখনও পুলিশ পছন্দ করিনি।

সেটা আগেই বলেছেন।

বকুল হাসছিল, জিরো জিরো সেভেন হলে অবশ্য আলাদা কথা। বা শার্লক হোমস।

ও দুটোই অলীক।

তা জানি মশাই। বাচ্চা ছেলেটাও জানে। ওরকম স্পাইও হয় না, ওরকম গোয়েন্দাও নেই। তবু কি থ্রিলিং ক্যারেকটার বলুন।

হ্যাঁ, সবসময়ে জয়ী, সবসময়েই সফল। ওরকম যদি বাস্তবেও হত!

হয় না, না?

বিশ্বরূপ হাসল, না। মাঝে মাঝে আমরা ভীষণ কাপুরুষের মতো আচরণ করি। পালাই। হারি। সাকসেস স্টোরির চেয়ে আমাদের আনসাকসেস স্টোরি অনেক বেশি লম্বা। তা যদি না হত তাহলে অপরাধীতে দেশটা এত ভরে যেত না।

আপনিও কি লাইসেন্সড টু কিল?

বিশ্বরূপ অসহায়ের মতো মুখ করে বলে, এদেশে সবাই লাইসেন্সড টু কিল।

বর্ধমান ছেড়ে গাড়ি এখন চমৎকার দৌড়োচ্ছে। ঘুমন্ত মুখটা বাঙ্ক থেকে

ঝুলিয়ে শ্যামল জিজ্ঞেস করে, ক'টা বাজে ?

বকুল বলে সাড়ে বারো ।

আমরা কোথায় ?

এই তো বর্ধমান পেরোলাম ।

ওঃ, তাহলে দেরি আছে ।

দেরি নেই । নামো । জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে ।

রাত দেড়টায় সত্যিই কলকাতা পৌঁছে গেল তারা । যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ছিল, যদি ভাগ্যক্রমে দু-একটা ট্যাক্সি থাকে সেই আশায় । অব্যবস্থায় ভরা বিশৃঙ্খল উচ্ছৃংখল এই দেশে কাউকে কারও দোষারোপ করার নেই ।

উদ্বিগ্ন শ্যামল বলে, আপনার গাড়ি আছে তো বিশ্বরূপ ?

বিশ্বরূপ তার জায়গা থেকে নড়েনি । নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকেছে সামনেই কার পার্ক । জানালার সোজাসুজি পুলিশ জিপটা দেখতে পাচ্ছিল বিশ্বরূপ । ঠিক এরকম জায়গাতেই থাকার কথা । পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একজন সশস্ত্র লোক জিপের পাশে দাঁড়িয়ে । চোখ গাড়ির দিকে ।

আছে । চলুন । গাড়িটা কিন্তু জিপ, আপনাদের একটু অসুবিধে হবে ।

অসুবিধে ! কী যে বলেন ! এই মাঝরাতে কলকাতা শহরে জিপই আমাদের রোলসরয়েস ।

বউ-বাচ্চা-মাল নিয়ে শ্যামল উঠল জিপের পিছনে । সামনে বিশ্বরূপ, ড্রাইভারের পাশে । বিশ্বরূপের ঘাড়ের কাছে সিটের কানায় একখানা নরম হাত । চুড়ির শব্দ । বকুল ঠিক তার পিছনেই বসেছে । ইচ্ছে করেই কি ? জীবন ক্ষণস্থায়ী । সেই জন্যই এর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান । সামান্য প্রাপ্তিকেও ফেলতে নেই । বিশ্বরূপ খুব গভীর ভাবে শ্বাস নিল । কলকাতার বাতাস অপরিশুদ্ধ । বায়ুদূষণ সাংঘাতিক । প্রকৃতিহীন এই শহরকে সবাই ভয় পায় । কিন্তু এই গভীর রাতে, জিপটা যখন ভ্যাম্প ঘুরে হাওড়া ব্রিজে উঠে এল তখন গঙ্গার ঠাণ্ডা জল-ছোঁয়া বাতাসটি বড় শুদ্ধ বলে মনে হয় ।

আপনার শীত করছে না ? মেয়েলি গলা ।

বিশ্বরূপ মাথা নাড়ল, না । কলকাতায় শীত কোথায় ?

শ্যামল হঠাৎ উদ্বেগের গলায় বলে, এই যাঃ, মাসীমার খবর নেওয়া হল না যে ! তাড়াহুড়োয় ভীষণ ভুল হয়ে গেছে ।

মাসীমার তো গাড়ি আসবেই । যদু থাকবে । চিন্তা কিসের ?

তবু, কার্টসি বলে একটা জিনিস আছে তো !

না নেই। উনি কার্টসি দেখিয়েছেন আমাদের ? কই একবারও তো বলেননি, এত রাতে পৌঁছোবে, ঠিক আছে আমার গাড়ি বরং পৌঁছে দেবে তোমাদের। বলেছেন একবারও ?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোধহয় একটা মনোমালিন্য পাকিয়ে উঠছে। বাড়িতে গিয়ে হয়তো জনান্তিকে সেটা ফেটে পড়বে। বিশ্বরূপ তার ধীর ভাঙা গলায় বলে, শ্যামলবাবু, রাস্তাটা একটু খেয়াল রাখবেন। কাঁকুড়গাছি আর বেশি দূরে নয়। আমরা মানিকতলা পেরোচ্ছি।

মানিকতলা ? এত তাড়াতাড়ি।

এরা বাড়ি ফিরছে। ভ্রমণের আনন্দের পর বাড়ি ফেরার নিশ্চিন্ততা। বাড়ি ফিরে সংসারে মজে যাবে। ঝগড়া-বিবাদ-মান-অভিমান খুনসুটি-ভালবাসা সব মিলেমিশে একটা সম্পর্ক শেষ অবধি স্থায়ী হবে। যতদিন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ না ঘটায়। বিশ্বরূপের ঠিক এরকম জীবন বোধহয় হবে না আর কখনও।

খুব নরম করে বকুল বলল, এক কাপ কফি খেয়ে যাবেন কিন্তু ! নইলে ছাড়ব না।

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে বলে, না। এত রাতে নয়।

আপনি আমাদের জন্য এত কষ্ট করলেন, আমাদের কিছু করতে দিচ্ছেন না কেন ?

শোধবোধ করতে চান ? পাওনা রইল।

এবার দিল্লি গেলে ঠিক আপনাকে খুঁজে বের করব। ঠিকানা টুকে রেখেছি।

ওয়েলকাম।

আপনি তো কাল বা পরশু, আপনার সুবিধেমতো আমাদের বাড়িতে লাঞ্চ বা ডিনারে আসতে পারেন ?

আমি কলকাতায় থাকব না। কালই হয়তো যশিডির ট্রেন ধরতে হবে।

কী এত কাজ বলুন তো আপনার !

ক্রাইম। ক্রাইম আফটার ক্রাইম।

শ্যামল বলে উঠল, এই যে ডানদিকে।

গাড়ি ডাইনে চওড়া রাস্তায় ঢুকল।

এবার বাঁ দিকে।

কয়েকবার মোড় নিল গাড়ি। তারপর মস্ত একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল।

মালপত্র নামল। ওরা নামল। ভদ্রতাসূচক কিছু কথাবার্তা ও আবার দেখা হওয়ার আশ্বাসের পর জিপ ঘুরিয়ে নিল মুখ। তারপর হু হু করে দূরত্ব বাড়িয়ে নিল চোখের পলকে। দূরত্বই ভাল। গার্হস্থ্য থেকে তার দূরে থাকাই উচিত।

অপারেশন সুরিন্দর। কলকাতার পুলিশ সন্দেহজনক দুজনকে গ্রেফতার করে রেখেছে। দলে আরও একজন ছিল, সে পালিয়ে গেছে। বিশ্বরূপ জানে, ধৃত দুজনের কেউ বা পলাতক লোকটি সুরিন্দর নয়। সুরিন্দরকে গ্রেফতার করতে হলে পুরোদস্তুর যুদ্ধ হবে। কিছু লোকের মৃত্যু অবধারিত। সুরিন্দর মিলিটারি প্রশিক্ষণ পাওয়া লোক, পুরোদস্তুর কম্যান্ডো নিজেকে সবসময়ে কন্ডিশনিং-এ রাখে। সারা ভারতবর্ষে তার সমব্যথী ও বন্ধু ছড়ানো। পীতাম্বর মিশ্রকে সপরিবারে খুন করে সে সোজা কলকাতায় চলে আসবে এটা নাও হতে পারে।

সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন গ্রেফতার না করে অনুসরণ করা ও গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা। তাতে গোটা দলের হদিশ পাওয়ার আশা থাকে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার কাজে পুলিশ কিছুটা ঢিলা।

স্যার, হোটেলে যাবেন?

লোক দুটোকে কোথায় রাখা হয়েছে?

হেয়ার স্ট্রিট লক-আপে-এ।

সেখানেই চলুন।

জিপ তাকে হেয়ার স্ট্রিটে নিয়ে এল। কয়েকজন ক্লান্ত কনস্টেবল ছাড়া বিশেষ কেউ নেই। তারাই খাতির করে লক আপে নিয়ে গেল তাকে কম্বলের বিছানায় দুজন চিতপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে

এরাই কি স্যার?

না। বড়বাবুকে বলবেন, অন্য কোনও অভিযোগ না থাকলে এদের কাল সকালে রিলিজ করে দিতে।

সুরিন্দরের ফোটোর সঙ্গে ডানদিকের লোকটার কিছু মিল আছে স্যার।

সুরিন্দর আর আমি দিল্লির একই ক্লাবে একসঙ্গে হকি খেলতাম। তাকে আধ মাইল দূর থেকেও চিনতে পারব।

তাহলে ঠিক আছে স্যার। বড়বাবুকে বলব।

ক্লান্ত বিশ্বরূপ এসপ্লানেডের কাছে একটা হোটেলের বুক করা ঘরে ফিরল রাত আড়াইটেয়। ধৃত দুজনকেই চেনে বিশ্বরূপ। পুরনো দিল্লির স্মাগলার।

বাংলাদেশ, নেপাল, চীন সীমান্ত দিয়ে এদের কাজ কারবার। সোনা, ইলেকট্রনিক জিনিস আর কসমেটিকস-এর কারবার, দুজনেই পুলিশের টাউট, আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে পুলিশের ভাইট্যাল লিঙ্ক। অপরাধী বটে, কিন্তু উপকারী বন্ধুও।

বিশ্বরূপ বিছানায় শুয়েই ঘুমোল। কলকাতায় তার কোনও কাজ নেই। সকালে ট্রেন ধরতে হবে। গন্তব্য যশিডি, পাটনা। সামনে ঘুমহীন অনেক রাত অপেক্ষা করছে তার জন্য। অপেক্ষা করছে গুপ্তঘাতক ও আততায়ী। অপেক্ষা করছে পরাজয়, গ্লানি, রক্তপাত বা গৌরবহীন জয়। তার চেয়ে বেশি ক্লান্তি, বিষাদ, শূন্যতা।

লম্বা ঘাসের ডাঁটি বেয়ে একটা পিঁপড়ে খামোখাই ওপরে ওঠে। দোল খায়। তারপর ফের নামে। ঘাসের গভীর অরণ্যে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। পিঁপড়েরা কি পথ চিনে চিনে ঘরে ফিরে আসতে পারে? বটপাতায় একটা পিঁপড়েকে তুলে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল বিশ্বরূপ। কোনও চঞ্চলতা প্রকাশ করেনি পিঁপড়েটা। নিশ্চিন্তে বটপাতা থেকে নেমে অচেনা মুলুকে গটগট করে হেঁটে চলে গেল কোথায় যেন। পিঁপড়ের দেশ নেই। মানুষের আছে! দাদু তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বনগাঁ সীমান্তে যেত। চেকপোস্টের এপাশে দাঁড়িয়ে ওই পাশের দিকে মায়াভরা চোখে চেয়ে থাকত। ওই দিকে কোথাও তার দেশ।

বিশ্বরূপ তার গভীর ঘুমের মধ্যেই পাশ ফেরে। হলধর ভূত আর জলধর ভূতের লড়াইতে কেউ হারে না, কেউ জেতে না। কিন্তু রোজ তারা লড়াই করে। শেষহীন লড়াই। অন্তহীন, জয় পরাজয়হীন এই লড়াই আজও হয় ওইখানে, ওই মাঠের মধ্যে, যেখানে জ্যোৎস্না রাতে পরীরা নামে, যেখানে মাঝে মাঝে কাদুয়া চোরকে গোলপোস্টে বেঁধে পেটানো হয়, আর ঘাসের মধ্যে নির্বিকার ঘুরে বেড়ায় পিঁপড়ে। প্রতিদিন ওই মাঠ ক্লান্ত পায়ে পেরোয় দুঃখী দেবীলাল।

॥ পাঁচ ॥

আঃ! আবার কতদিন পর কলকাতার খবরের কাগজ। কলকাতার ভোর। কলকাতার সোঁদা স্যাঁতা গন্ধ! গত রাত্রি যেন দুঃস্বপ্নের মতো প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছে।

মাঝরাত্তিরে শুয়েও ভোরবেলা উঠেছে শ্যামল। পৌনে ছটায়। উঠেই কেমন ফ্রেশ লাগছে। ক্লান্তি নেই, গ্লানি নেই। মনটা ফুরফুর করছে। আজ অবধি তার ছুটি। কাল জয়েন করবে অফিসে। একটি আলস্যে ভরা শ্লথ দিন সামনে পড়ে আছে ভাবলেই মনটা খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

তার ফ্ল্যাটটা মাঝারি মাপের। তিনটে শোওয়ার ঘর, একটা লম্বা ডাইনিং কাম লিভিং, ছোটো ব্যালকনি। চারতলার মনোরম আবাস, তার রঙিন টি ভি আছে, দেয়ালে প্লাস্টিক পেইন্ট, দু-চারটে বেশ দামী আসবাব, ওয়াল ক্যাবিনেট, প্রাণপণে খরচ করে সাজিয়েছে তারা। যদি তাতে সুখী হওয়া যায়। মুস্কিল হল সুখ একবগ্গা জিনিস নয়। এই যে সকাল বেলাটা তার এত ভাল লাগছে—এ সুখ হয়তো বেলা দশটায় আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাবে, ব্যাট করতে নামবে তিক্ততা এবং রাগের একটি জুটি। তারা হয়তো অনেকক্ষণ টিকে থাকবে উইকেটে। যতক্ষণ বকুল ঘুম থেকে উঠছে না ততক্ষণে নিশ্চিন্ত। উঠলেই কিন্তু অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।

বকুল এখন গভীর ঘুমে। পাশে টুকুস, গভীর ঘুমে। চটপট নিজের হাতে চা করে নিল শ্যামল। তারপর চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে বসল তার অভ্যস্ত প্রিয় সোফায়, পাশেই জানালা। পুবের রোদ একটু কোনাচে হয়ে এই সময়টায় ঢোকে তার ফ্ল্যাটে। দুপাশে এবং সামনে উঁচু উঁচু বাড়ি থাকায় এ বাড়িতে ঢুকতে রোদকে রীতিমতো ব্যায়াম করতে হয়। তা হোক তবু তার ফ্ল্যাটে যথেষ্ট আলো হাওয়া আছে। সে সুখী। যতক্ষণ বকুল ঘুমোচ্ছে ততক্ষণ সে সুখী...

কিন্তু বকুল জাগা মানেই বিবেক জাগল। বিবেক জেগে উঠেই তাকে নিয়ে পড়ল। সে যে কত অপদার্থ, কত অযোগ্য, কত ভীতু, কত অসফল সেই সব কথাই তার বিবেকের হয়ে প্রম্পট্ করে বকুল। সেই বকুল যাকে ছাড়া বাঁচবে না, নির্ঘাত মরে যাবে বলে মনে হয়েছিল তার, একদা। ওই একদা কথাটাই তাকে পেড়ে ফেলে। কেন সে একদা যে অত বোকা ছিল, প্রেমিক ও রোমান্টিক। শেকস্‌পীয়র সাহেবও কি বোকা ছিলেন না? রোমিও জুলিয়েটের ট্র্যাজিক প্রেমের গল্প আজও দুনিয়াসুদ্ধ লোককে কাঁদায়। দুনিয়াসুদ্ধ লোক যদি তারই মতো বুরবক হয় তাহলে কী করতে পারে শ্যামল? শেকসপীয়র সাহেব, যদি রোমিও আর জুলিয়েটকে মিলিয়ে দিতেন তাহলে কী হত স্যার, একবার ভেবে দেখেছেন! প্রেমের কথাটুকুই লিখেই কলম পুঁছে ফেললেন, কিন্তু গল্পের পরও তো গল্প আছে। ধরুন স্যার, রোমিও আর জুলিয়েট বিয়ে বসল, তিন

মাস পর থেকে শুরু হল খটাখটি, তারপর চেঁচামেচি এবং চ্যাঁ ভ্যাঁ, আর তারপর সাহেবদের দেশ বলে কথা, রোমিওর হয়তো জুটল আরও জুলিয়েট, জুলিয়েটের জুটল আরও রোমিও, কেঁচে গেল বিয়ে কেঁচে গেল প্রেম, খাট্টা হয়ে গেল সম্পর্ক । এই সব প্রেমের কী দাম আছে মশাই ? তবু যে প্রেমটা কেন বর্তে আছে দুনিয়ায় সেটাই হল প্রশ্ন

আজকাল তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, খুব মনে হয়, মানুষের এইসব ভ্যাবলাকান্ত আচরণের পিছনে কারও একটা অদৃশ্য হাত আছে । অতি পাজি ও ধূর্ত একটা হাত । তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে হাতটা ওই বিতর্কিত পার্সোনালিটি ভগবানের তাহলে স্বীকার করতেই হয় ওরকম লোকের জন্য গির্জা-মন্দির-মসজিদ বানানো নিতান্তই গাঁটগচ্চা দেওয়া রামমন্দির বাবরি মসজিদের কাজিয়ার পিছনে কি ওই কালো হাতটাই নেই ? একটা অ্যান্টি গড মিছিল বের করলে কেমন হয় ? তাতে স্লোগান থাকবে, ভগবানের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও ।

রোদটা চোরের মতো ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে ঘাড়ের কাছে । উত্তরমুখো ফ্ল্যাট বলে শীতে রোদ আস না । এই ভৌগোলিক গণ্ডগোলের জন্য সে ছাড়া আর কোন অদূরদর্শী আহাম্মক দায়ী ! সকালের এই এক চিলতে রোদ দাঁত কেলিয়ে তার সঙ্গে একটু হেঁ হেঁ ভদ্রতা করতে আসে । মাঝে মাঝে তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, গেট আউট ! নিকালো হিয়াসে ! ছ্যাঁচড়া কোথাকার, যারা কপাল করে এসেছে তাদের বাড়ি গিয়ে চাকরের মতো শীতের রোদ ঢেলে দিয়ে এসো গিয়ে । তোমাদের সবাইকে হাড়ে হাড়ে জানি ।

সকালের সুখ-সুখ ভাবটা মানসিক উত্তেজনায় চলে যেতে চাইছে । শ্যামল নিজেকে শাসন ও সংযত করল । রোদের দিকে চেয়ে বলল, অলরাইট ম্যান, তোমার ওপর আমার রাগ নেই । এসেছো যখন, ওয়েলকাম । কিন্তু আমার দুঃখের কপালটার কথাও একটু ভেবো হে । দুনিয়ায় আমার যত চেনা-জানা সবাই কেমন সাউথ ফেসিং ফ্ল্যাট পায় ? কার কালো হাত অলক্ষ্যে কাজ করে বলো তো ! গ্রেটা গার্বো নয়, সায়রা বানু নয়, শ্রীদেবী নয়, মোস্ট অর্ডিনারি একটা বাঙালি মেয়ের কাছে এই নর্থ ফেসিং ফ্ল্যাটের জন্য আমাকে কিরকম নাকাল হতে হয়, জানো ? আর বদমাশ প্রোমোটার ব্যাটা আমাকে বুঝিয়েছিল, বেশ মোলায়েম আন্তরিক গদগদ গলায় সেই পাক্কা হেড টু ফুট চারশো বিশ আমাকে বুঝিয়েছিল, দুটো ভ্রূ একটু বিস্ময়ে উপরে তুলে বুঝিয়েছিল, সে কী দাশগুপ্ত সাহেব, আপনিও ওই দক্ষিণের দলে ? আপনি তো কালচার্ড মানুষ,

নিশ্চয়ই জানেন, আর্টিস্টদের পছন্দ উত্তরের ফ্ল্যাট, উত্তরের আলো হচ্ছে ছবি আঁকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। যার চোখ আছে, পছন্দ আছে, রুচি আছে সে যে কেন দক্ষিণের ফ্ল্যাট নেয়! আমার হয়ে গেল ওই শুনে। তেলে ভগবান মজে, আমি তো ছার। ভেবে বোসো না যে আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। তবে আমি যে একসময়ে একটু আধটু ছবিও আঁকতুম, সেই ধূসর স্মৃতি এমন ঠেলে উঠল যে, অন দি স্পট ডিসিশন নিয়ে ফেললুম, নাঃ, উত্তরের ফ্ল্যাটই নেবো। এখনও সেই আহাম্মকির হ্যাপা সামলাতে হচ্ছে।

কাগজে মন বসাতে পারছিল না শ্যামল। কত ব্যাং ব্যাং খবরে বোঝাই, মিথ্যের ঝুড়ি, পলিটিকসের কূটকচালিতে আস্তাকুঁড় খবরের কাগজ জিনিসটা না হলে কেন যে তবু সকালে মানুষের কোষ্ঠ পরিষ্কার হতে চায় না তা বোঝে না শ্যামল। চা খেতে খেতে অন্তত পঁচিশ দিন বাদে কলকাতার খবরের কাগজ পড়ছে সে।

পাতা উল্টে একটা খবরে চোখ আটকাল তার। দেওঘরে একজন এম পি তাঁর নিজের বাড়িতে খুন হয়েছেন। হত্যাকারীরা উগ্রবাদী এবং বহিরাগত। হত্যার আগে কয়েকদিন তারা নিহতের পুরো পরিবারকে একরকম বন্দী করে রাখে এবং প্রচুর টাকা আদায় করে নেয়। সন্দেহ করা হচ্ছে উগ্রবাদীদের নেতা কুখ্যাত সুরিন্দর। পীতাম্বর মিশ্রকে সপরিবারে খুন করার পর তারা গভীর রাতের ডাউন দানাপুর এক্সপ্রেসে কলকাতা পালিয়ে গেছে।

সন্ত্রাস আর সন্ত্রাস। অন্তত পশ্চিমবঙ্গটা এদের আওতায় ছিল না এতদিন। এখন যদি একে একে দুইয়ে দুইয়ে এখানেও ঢুকতে থাকে তাহলে আর ভরসাটা কিসের? ওরা বাজারে হাটে যেখানে সেখানে ট্যারা-রা-রা ট্যাট...ট্যাট করে ছেড়ে দিচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, টু হুম ইট মে কনসার্ন। রাম গেল না রহিম গেল তাতে কিছু যায় আসে না। মাত্র দুটো এ কে ফর্টি সেভেন নিয়ে দুটো শিখ উগ্রবাদী গোটা পুরুলিয়াকে প্রায় দখল করে নিয়েছিল, ভোলেনি শ্যামল। মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী একদিন বুড়ো রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য বাংলাকে জয় করে নিয়েছিল, তার চেয়েও এটা আরও খারাপ ঘটনা। আবার তার চেয়েও খারাপ এই সুরিন্দরের এদিকপানে আসা।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু নেই ঠিকই, যেমন ভগবান নেই, হিপনোটিজম নেই, ভূত নেই, পরী নেই, পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই; তবু শ্যামলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ ধরে। শ্যামল সেটা বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। হঠাৎ দেয়ালের ইলেকট্রনিক ঘড়িটার দিকে চেয়ে সে ঝড়াক করে

উঠে দাঁড়াল   বাজার ! আজ সকালে বাজার না হলে রান্না হবে না । বাজার এনে ফেলতে হবে পৌনে আটটার মধ্যেই, কারণ প্রতি সকালে সে সাতটা পঞ্চাশ মিনিটের টিভি-র ইংরিজি খবরটা ভক্তিভরে দেখে এবং শোনে । সকালের খবরটায় কিছু বিদেশী সংবাদ থাকে

ঘরে এসে পাতলুন চড়াতে চড়াতে সে তার বউ আর মেয়েকে লক্ষ করে । তার গোটা দুনিয়া কনসেনট্রেট করে আছে এইখানে, ওই বিছানায় । সে যা-কিছু করে তার যাবতীয় শ্রম ও চিন্তা, উদ্বেগ ও প্ল্যানিং সব কিছু মাত্র এই দুজনকে কেন্দ্র করে । অথচ পৃথিবীটা কত বড় এবং তাতে জীবাণুর মতো কোটি কোটি মানুষ । রোগ-ভোগ, এইডস, ক্যানসার, ভূমিকম্প, বন্যা, আগুন, সুরিন্দর সবাই মিলে এত মেরে মেরেও নিকেশ করতে পারছে না । রক্তবীজের ঝাড় জনসংখ্যা ক্রমে সংখ্যা ছাড়িয়ে চলেছে অসীমের দিকে । এই এত মানুষের জন্য তার কোনও চিন্তা নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই । তার জন্য মাত্র দুটো মানুষ ! ওনলি টু ! এবং দুটোই লেডিজ ।

বকুলের মুখে কোনও আঁচিল ছিল কি ? সর্বনাশ ! মনে তো পড়ছে না ! কিন্তু ঘুমন্ত বকুলের মুখে বাঁ চোখের নীচে মস্ত আঁচিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ! তাহলে কি ছিল, সে লক্ষ করেনি এতদিন ! এবং আঁচিলটার ফলে বকুলকে যে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, এটাও সে লক্ষ করেনি নাকি এতদিন ! সর্বনাশ ! এতকালের—না হোক পাঁচ বছরের তো বটেই বিয়ে-করা বউয়ের আইডেন্টিফিকেশন মার্কগুলো তার জানা নেই, এটা কেমন কথা ? সত্য বটে মেয়েদের চেনে এমন বাপের ব্যাটা আজও জন্মায়নি, তা বলে আঁচিলটা এতকাল তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে রয়ে গেল কি করে ?

একটু ঝুঁকে সে দেখতে পেল, না আঁচিল নয়, একটা মাছি । আগন্তুকের সাড়া পেয়েই উড়ে গেল । বাঁচা গেল বাপ ! শ্যামল তো ঘামতে শুরু করেছিল, মাঝরাতের ট্রেন থেকে কোনও পরমহিলাকে ঘুমচোখে নামিয়ে নিয়ে এল নাকি !

জামা পরতে পরতে হঠাৎ আবার শ্যামল একটু ঝুঁকে বকুলের মুখখানা দেখল । হতেও পারে, এ এক পরমহিলাই । মুখে একটা মৃদু সুন্দর সুখের হাসি, একটা স্বপ্নময়তার চোরা ঢেউ যেন উথলে আনছে মুখের লাবণ্যকে । বকুল সুন্দর বটে, কিন্তু এ যে সামথিং এলস্ । পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে শ্যামল । সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এখন এই মুহূর্তে বুকল তার বউ নয় । বকুল এখন অন্য কাউকে দেখছে স্বপ্নে । অন্য এক পুরুষ কি ? যার মধ্যে শ্যামলের

ভ্রূ-ব্যাকগুলো নেই ?

কে লোকটা ? কাল গাড়ির সেই পুলিশ অফিসারটি কি ? সেই বিষণ্ন রুস্তম ! হ্যাঁ, হ্যান্ডসাম, মেলাঙ্কলিক, লোনলি সব ঠিক আছে । পুরুষালিও । তাই বলে...ঠিক আছে ভাই, চালিয়ে যাও । চালিয়ে যাও । লাইফ তো দুদিনের বই নয় । যা পাও, কুড়িয়ে কাচিয়ে লুটে পুটে তুলে নাও জীবন থেকে । শ্যামল আদ্যন্ত স্পোর্টসম্যান । কিছু মাইন্ড করবে না ।

ছোকরা ব্রড মাইন্ডেড বলে ভেবেছিল শ্যামল । এখন মনে হচ্ছে, ডাল মে কুছ কালা ভি হ্যায় । এমন তো হতেই পারে যে, ট্রেনে গতকাল অনেকক্ষণ দুজনে দুজনকে একটু একলাএকলি পেয়েছিল । এবং তখন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় ! কিছুই অসম্ভব নয় । ট্রেনটা ওইরকম অসম্ভব লেট না করলে হয়তো ঘটতে পারত না ব্যাপারটা ।

ট্রেন লেট করা যে খুব খারাপ তা বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করল সে । ট্রেন লেট হওয়ার বিরুদ্ধে সে কাগজে খুব কড়া করে চিঠি লিখবে ।

এমন কি হতে পারে যে, সুরিন্দরকে ধরার জন্যই বিশ্বরূপকে দিল্লি থেকে পাঠানো হয়েছে ! হতেই পারে । সে ক্ষেত্রে বিশ্বরূপের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম । সুরিন্দরের এ কে ফর্টি সেভেন আছে । বাক আপ সুরিন্দর তোলো এ কে ফর্টি সেভেন, চালাও গোলি, খতম কর দো শ্যালেকো...

বাজার করাটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়ে থাকে শ্যামল । তার ভিতরে যে লড়াকু লোকটা আছে সে মালকোঁচা মারে, আস্তিন গোটায়, পাঁয়তারা ভাঁজে, বাজার মানেই ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ, প্রত্যেকেই দুর্যোধন, দুঃশাসন, জরাসন্ধ । কাম অন দুর্যোধন, কাম অন দুঃশাসন...

স্যার, অনেকদিন দেখিনি আপনাকে ! পুজোয় বাইরে গিয়েছিলেন বুঝি ! ভাল পার্সে আনলাম একদিন, আপনি তো পার্সে খুব ভালবাসেন, খুব মনে হচ্ছিল আপনার কথা ।

সাবধান ! সাবধান ! বলে ভিতরের লড়াকু লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, দুঃশাসন প্যাঁচ কষছে, স্যার ডেকে, নেই আঁকড়ে ভাব করে তোমাকে ভিজিয়ে ফেলছে, বী স্ট্রং অ্যান্ড আনবেন্ডিং...

কিন্তু এখনকার দুঃশাসনদের অস্ত্রশস্ত্র আলাদা । এ এক অন্য ধরনের এ কে ফর্টি সেভেন ।

আজ ফার্স্টক্লাস কৈ আছে স্যার, এ বাজারে এই প্রথম উঠল । দর একটু

কম করে দেবোখন ।

শ্যামল ভিজল এবং নেতিয়ে পড়ল । দশখানা কৈ মাছ দাপাতে লাগল তার নাইলনের ছোটো ব্যাগে । সম্ভবত তারাও ভর্ৎসনাই করতে চাইছে তাকে । সে যে কলকাতায় ছিল না, অনেকদিন সে যে বাজারে আসেনি এটা লক্ষ করেছে আলুওয়ালাও । লক্ষ করেছে সবজিওয়ালাও । লক্ষ করেছে ডিমওলিও । খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার । তার বিরহে এরা খানিকটা কাতরও ছিল। দীর্ঘ বিরহের পর নিজের প্রিয়জনকে দেখে মানুষ যেমন খুশি হয় তেমনি খুশির ভাব এদের মুখেচোখে ! পকেটে রুমাল থাকলে চোখের আনন্দাশ্রু মুছে ফেলত শ্যামল । তাড়াহুড়োয় রুমাল আনতে ভুলে গেছে । তবু সজল চোখে চারদিকে চেয়ে দেখল শ্যামল, ওহে কৃষ্ণ, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর, আমাকে দেখতে দাও কে আমার শত্রু, কে আমার মিত্র । আজ শ্যামল শত্রুপক্ষ খুঁজেই পেল না । সকলকেই তার বন্ধু বলে মনে হতে লাগল ।

কৈ মাছ ! বলে আর্তনাদ করে উঠল বকুল । আর্তনাদ না হর্ষধ্বনি তা ঠিক বুঝতে পারল না শ্যামল । সে তো হর্ষধ্বনিই আশা করছিল । সিজনের প্রথম কৈ !

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আত্মবিশ্বাসহীন গলায় সে প্রতিধ্বনি করে, কৈ মাছ ! হ্যাঁ, কৈ মাছই তো ।

কঠিন-সুন্দর, হাস্যবিহীন মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে পলকহীন চোখে তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বকুল বলে, কে কাটবে এখন কৈ মাছ ! সরলা আজ আসেনি । ওই কাঁটাওলা মাছ এখন কে সামলাবে ! কাল রাতেই না তোমাকে বলে রেখেছিলুম, শুধু ডিম পেঁয়াজ আর আলু আনলেই হবে ।

শ্যামল খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলে, নো প্রবলেম । ডিম সামনের মুদির দোকানেই পাওয়া যায় । মাছ বরং ফ্রিজে রেখে দাও ।

ফ্রিজে ! জ্যান্ত মাছ কখনও ফ্রিজে রাখে কেউ ? কী বুদ্ধি !

তাহলে ।

জ্যান্ত মাছ জলে রাখতে হয় ।

ইয়েস ইয়েস, মাকেও দেখেছি ছেলেবেলায় জিওল মাছ জলে ছেড়ে রাখতে । ভুলে গিয়েছিলাম ।

রাখলেই তো হল না । জিইয়ে রাখলে সারাদিন খলবল করবে । সে এক অশান্তি ।

কুইজ কন্টেস্টের প্রতিযোগীর মতো শক্ত প্রশ্নের পাল্লায় চিন্তিত হয়ে পড়ে

শ্যামল। ছোটোখাটো কত ব্যাপারই যে কী সঙ্ঘাতিক হয়ে উঠতে পারে।

যাবে! যাও না ওই লাল বাড়িটার পিছনে থাকে। ওর বরের নাম পরিতোষ।

শ্যামল ভারী অবাক হয়ে বলে, কোথায় যেতে বলছো!

সরলাকে ডেকে আনতে। খবর দিলেই চলে আসবে। ভাল ঘুম হয়নি, শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। সরলা এলে সব সামলে নেবে। আজ একটু রেস্ট নেওয়া দরকার।

ঝাড়া দশ মিনিট এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল শ্যামল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে হল। লালবাড়ির পেছনে যে একটা বস্তি আছে তাই জানত না সে। বস্তি এমনিতেই নোংরা ও বিপজ্জনক বলে সে শুনেছে। পরিতোষকে সে চেনে না। সরলাকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! বস্তিবাসীরা ফ্ল্যাটবাড়ির লোকদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কি? তারা আগন্তুকদের কী নজরে দেখে? অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে। তৎসহ গভীর উদ্বেগ।

অতিশয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল শ্যামল। এ যেন সুরিন্দরের রাইফেলের মুখে এগিয়ে যাওয়া।

লালবাড়ির পিছনে বস্তির চত্বরে ঢুকেই সে দেখতে পেল, রাস্তাময় বাচ্চা কাচ্চা খেলছে। তার মেয়ের চেয়েও ছোটো বাচ্চারা বেওয়ারিশের মতো ধুলোবালি নোংরায় পড়ে আছে। সর্পিল একটা রাস্তায় প্রাণ হাতে করে ঢুকল সে এবং একজন মাঝবয়সী এক মহিলাকে পেয়ে একটু কাঁপা গলায় বলল, পরিতোষের ঘরটা কোথায়?

পরিতোষ! আরও ভিতরবাগে চলে যান। শেষের বাঁ দিকের ঘর।

সরলা কি আছে?

থাকতে পারে। দেখুন গিয়ে।

এগোতেই একটা বাঁধানো চাতাল। সেখানেও বিস্তর বাচ্চা, তবে নোংরা সব কাপড় শুকোচ্ছে, আঁশটে বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে পচা মাছ রান্নার।

দাদাবাবু! বলে আহ্লাদিত সরলা আঁচল সামলে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত কোলের বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল।

উদ্বেগটা কেটে গেল শ্যামলের। একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, তোমার বউদি ডাকছে তোমাকে।

কাল সন্ধেবেলাই তো ফেরার কথা ছিল আপনাদের! আমি গিয়ে সাতটা থেকে সেই রাত ন'টা অবধি বসেছিলুম।

হ্যাঁ, আমরা মাঝরাতে পৌঁছেছি ।

আপনি যান,আমি দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি । খবর পেলে কোন সকালে চলে যেতাম ।

বস্তি ছেড়ে ভদ্রলোকদের এলাকায় ঢুকে আরামের শ্বাস ফেলল শ্যামল । চেনা দোকান থেকে এক প্যাকেট দামী ব্র্যান্ডের সিগারেট কিনল । প্রবলেম সল্‌ভড । একটা মস্ত কাজ করার পর বিজয়ীর মতো লাগছে না নিজেকে ? কৈ মাছ রান্না হবে, বকুলের বিশ্রাম হবে, এর চেয়ে সুসংবাদ আর আপাতত কী হতে পারে ?

সিগারেট ধরাতে গিয়েই হঠাৎ বিশ্বরূপকে মনে পড়ল । নন স্মোকার যখন সিগারেট খায় তখন স্মোকাররা স্পষ্টই বুঝতে পারে, লোকটা আনাড়ি । বিশ্বরূপ তাদের পারিবারিক জীবনে খানিকটা ঢুকে পড়ল নাকি ? হয়তো আর দেখা হবে না কখনও, শরীরী হয়ে আর আসবে না কাছাকাছি, কিন্তু স্মৃতি হয়ে ? চোরাপথে ? গোপন হৃদয়ের দরজা খুলে ?

বিশ্বরূপ কি একজন হিরো ? ডার্ক, টল, হ্যান্ডসাম । জীবন-মৃত্যু নিয়ে নিয়ত ছেলেখেলা করে ! যার প্রতিদ্বন্দ্বী সুরিন্দরের মতো ভয়ংকর সব লোক ! মেয়েরা কি শুধুই বীরের পূজারী ?

এইজন্যই খেলোয়াড়, হিন্দি সিনেমার নায়ক, পাইলট এবং গায়কদের তেমন পছন্দ করে না শ্যামল । এরা হল অনেকটা দীপশিখার মতো যাতে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে চায় নারী-পতঙ্গেরা । একটু যাত্রার ডায়ালগের মতো শোনালেও কথাটা তো আর মিথ্যে নয় ।

কিন্তু বিশ্বরূপ হিরো কেন ? বিশ্বরূপকে কাল অধিক রাত্রি পর্যন্ত পছন্দই তো ছিল শ্যামলের, আজ সকাল থেকে তবে অপছন্দ হচ্ছে কেন ? বেলা বাড়ছে, খিদে পেয়েছে । খুব সম্ভবত সরলা গিয়ে জলখাবারের জন্য পরোটা আর আলু চচ্চড়ি বানাচ্ছে । তবু পাড়ার মস্ত সুন্দর পার্কটাতে কিছুক্ষণ বসে গভীরভাবে চিন্তা করল শ্যামল । দুটো সিগারেট উড়ে গেল । কোথাও পৌঁছানো গেল না । চিরকাল তার চিন্তার ধারা একটা চৌমাথায় এসে হারিয়ে যায় । পথ পায় না । ওইখানে একজন ট্র্যাফিক পুলিশ থাকলে তার সুবিধে হত, চিন্তার গতিটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারত সঠিক রাস্তায় ।

পরোটাই । এবং আলু চচ্চড়িও । সরলাকে পাওয়া না গেলে এই প্রিয় জলখাবারটি আজ কিছুতেই জুটত না শ্যামলের কপালে । বড়জোর পাঁউরুটি এবং সম্ভবত একটি ডিমসেদ্ধ ।

তিনখানা পরোটা খেয়ে তৃপ্ত শ্যামল উঠল এবং খবরের কাগজ নিয়ে আর একবার বসল গিয়ে প্রিয় সোফায়। খবরের কাগজ কী বলছে? খবরের কাগজ বলছে, পৃথিবীর অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। দিনকে দিন আরও খারাপ হবে। এবং আরও। শ্যামল সেটা জানে। কথা হল, ততটা খারাপেই হবে যার ঢেউ এসে লাগবে তার চারতলার নিরিবিলি প্রিয় এই ফ্ল্যাটে? ভাবী পৃথিবী গোল্লায় যাক, কিন্তু টুকুসটার কোনও বিপদ হবে না তো। একটু আগে বস্তির বাচ্চাগুলোকে দেখে এসেছে সে, ওরকম কিছু অপেক্ষা করছে না তো তার ডলপুতুলের মতো মেয়েটার জন্য?

তোমার মুখটা আজ এত গোমড়া কেন বলো তো। বাথরুমের দরজায় মুখোমুখি দেখা হল দুজনের। বকুল বেরোচ্ছে, শ্যামল ঢুকতে যাচ্ছে। কথাটা বলল বকুল।

শ্যামল তার গালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে, বোধহয় দাড়ি কামাইনি বলে।

দাড়ি কামালেই বুঝি তোমাকে হাসিখুশি লাগে?

মেলাঙ্কলিক ফেস-এরও তো একটা অ্যাট্রাকশন আছে।

সে তোমার মুখ নয়। বিষণ্ণ মুখ আজ গোমড়া মুখ কি এক হল?

তফাতটা কি?

সবার মুখে বিষাদ থাকে না, মানায়ও না।

তাহলে কাকে মানায়। হু ইজ দ্যাট রোমিও?

বাঃ রে, কাকে মানায় তা কে খুঁজতে গেছে। তোমাকে মানায় না এটা বলতে পারি।

আমাকে কিছুই মানায় না, আমি জানি।

আহা, আবার ছেলেমানুষের মতো রেগে যাচ্ছে দেখ। তোমাকে অপমান করার জন্য মোটেই কথাটা বলিনি। শুধু সিম্পল একটা প্রশ্ন করেছি, মুখ গোমড়া কেন? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল?

হল। আমি মোটেই গোমরা মুখ করে নেই। আমি একটু চিন্তিত। সেটাকে গোমড়া মুখ বললে অপব্যাখ্যা হয়।

আচ্ছা বাবা, ঘাট মানছি। চুলে জড়ানো গামছাটা খুলতে খুলতে শ্যামলের দারুণ সুন্দরী স্ত্রী স্নানের পর আরও সুন্দরী দেখাচ্ছে—বলল, জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে তুমি চিন্তিতই বা কেন? সকাল থেকে কী এমন ঘটল চিন্তার মতো!

শ্যামল তিলেক বিলম্ব না করে ঝটিতি একটা গল্প বানিয়ে নিয়ে বলল, সুরিন্দর ইজ হিয়ার অ্যান্ড বিশ্বরূপ ইজ হিয়ার। একটা ফ্যাটাল এনকাউন্টার অবশ্যম্ভাবী। উই মে লুজ এ গুড ফ্রেন্ড।

অবাক বকুল বলে, কিচ্ছুই তো বুঝলাম না, কী যা তা বলছো ?

শ্যামল একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিশ্বরূপ এখানে কেন এসেছে জানো ? সুরিন্দরকে ধরতে।

সুরিন্দরটা কে ?

ওঃ, ইগনোরেন্স দাই নেম ইজ উওম্যান। সুরিন্দর হল সেই সাংঘাতিক আতঙ্কবাদী যার ভয়ে সরকার থরহরি। মাত্র কয়েকদিন আগে দেওঘরে একজন প্রাক্তন এম পি-কে সপরিবারে খুন করেছে। টোটাল ম্যাসাকার। সে এখন কলকাতায়। বিশ্বরূপের আসার কারণ হল সুরিন্দর।

এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারল কি শ্যামল। বউয়ের স্বৈরিণী মুখখানা সে জহুরির মতো লক্ষ করছিল। সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল কি মুখটা ?

তোমাকে কে বলল ?

নির্বিকারচিত্তে মিথ্যে কথা বলে গেল শ্যামল। কে আবার বলবে ! বিশ্বরূপ নিজেই। করিডোরে সিগারেট খেতে খেতে। ওর মুখে যে মেলাঙ্কলিক ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছো সেটা আসলে ভয়।

সুরিন্দর কি টেররিস্ট ?

টেররিজমের গডফাদার বলতে পারো। সুরিন্দর ইজ দা রুট অব টেররিজম। আজকের কাগজেই খবরটা আছে। দেখবে ?

কেন যে মেয়েরা সাজে, সেটা এক বিরাট কুইজ শ্যামলের কাছে। বকুল স্নান করেছে। সব রূপটান ধুয়ে মুছে গেছে মুখ থেকে। এখন তার কাটা কাটা মুখচোখে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের যে অসহনীয় প্রকাশ ঘটেছে তা কি বোঝে তার বোকা বউ ?

বকুল শ্লথ অন্যমনস্ক হাতে মাথা থেকে গামছাটা সরিয়ে আনমনা পায়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

বাথরুমে আজ গান গেয়ে হুল্লোড় করে স্নান করল শ্যামল। গল্পটা দারুণ বানিয়েছে সে। এ কথা খুবই সত্য যে, দুনিয়াতে কোথাও কিছুরই পুরো দখল পাওয়া যায় না। এই যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, কন্যা-পুত্র-কলত্রাদি কোনও কিছুর ওপরেই মানুষের পুরো প্রভুত্ব নেই। লিজ, লং লিজ বা শর্ট টার্ম পজেশন মাত্র। বউও তাই। বকুলের সম্পূর্ণ হৃদয় জয় করে নেওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা

তার নেই । সম্ভবও নয় । তাহলে একই সঙ্গে তাকে রাজীব গান্ধী, অমিতাভ বচ্চন, ফাইটার পাইলট, ব্রিগেডিয়ার, হেমন্ত মুখার্জি, মাইক টাইসন, মারাদোনা এবং বোরিস বেকার হতে হয় । সুতরাং আংশিক দখল নিয়ে সে মোটামুটি খুশি । মাঝে মাঝে এক আধজন আগন্তুক যদি সেই দখলে নাক গলায় তাহলেও তেমন কিছু নয় । সেটা স্পোর্টিংলি নিতে পারে শ্যামল । তবে তখন নিজের দখলটা একটু জাহির করেও নেওয়া উচিত । বিষণ্ণবদন ওই পুলিশ অফিসারটি যে খানিকটা মাথা খেয়েছে বকুলের এবং বকুল ওই বিষণ্ণবদন পুলিশ অফিসারের তাতে সন্দেহ নেই । নইলে কেউ গভীর রাতে কষ্ট করে বাড়ি পৌঁছে দেয় ? গাড়ির পরিচয় যত প্রগাঢ়ই হোক তা গাড়িতেই শেষ হওয়া উচিত । তাকে আবার বাড়িতে লানচে বা ডিনারের নেমন্তন্ন করা কেন বাপু ?

যখন স্নান সেরে বেরোল শ্যামল তখন বাইরের ঘরে খবরের কাগজের ওপর আলুথালু হয়ে ঝুঁকে আছে বকুল । আলুথালু বলেই মনে হল শ্যামলের । শোয়ার ঘরে এসে আলমারির পূর্ণাঙ্গ আয়নায় এক কাপুরুষের মুখোমুখি হল শ্যামল ।

॥ ছয় ॥

গান্ধীবাদ দিয়ে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ দিয়ে যে শেষ করতে চায়, তাকে কী বলা যায় বলো তো । পাগল ? আমি কিন্তু মিশ্রজীকে পাগল বলিনা । আমি বলি ও ছিল চঞ্চলমতি, সবসময়ে জীবন নিয়ে নানা পরীক্ষা করত । কী বলো তাকে তোমরা ? গবেষণা ? তাই হবে । উনি বোধহয় জীবন নিয়ে সবসময়ে রিসার্চ করতেন ।

ঘরটা একটু অন্ধকার । একটা স্ট্যান্ডের ওপর শেড দেওয়া একটা মাত্র আলো । ভজনা দেবীর মুখ দেখা যাচ্ছে না ।সাদা থানের ঘোমটাটা আজ বোধহয় উনি একটু বেশিই টেনে দিয়েছেন কপালের ওপর । একটা ভাগলপুরী সুতির চাদরে গা ঢাকা । পাটনায় একটু শীত পড়ে গেছে । আজ ভজনা দেবী কোনও মক্কেল নেননি । তাঁর মুখোমুখি লম্বা সোফায় পাশাপাশি অজিত আর বিশ্বরূপ ।

ঈষৎ ভাঙা ধীর গলায় চোস্ত হিন্দিতে বিশ্বরূপ বলে, ওঁর ওই রিসার্চ কি আপনি পছন্দ করতেন না?

তা কেন ? যে লোকটা বুড়ো বয়সেও নিজেকে ভাঙচুর করে ফের গড়তে

চাইছে সে তো জ্যান্ত লোক। মিশ্রজীকে বার্ধক্য স্পর্শও করেনি। না, তাঁর বাইরের জীবন আমাকে কখনও ডিস্টার্ব করেনি।

আপনাদের ডিভোর্স হয় বেশ পরিণত বয়সেই, সাধারণত যে বয়সে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি আমরা বড় একটা দেখতে পাই না।

খুব ঠিক কথা। তবে আইনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার অনেক আগেই মিশ্রজীর সঙ্গে আমার আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই সে সব ব্যাপার জানতে চাইবে না।

আমি শুধু জানতে চাই, মিশ্রজী কি অত্যাচারী পুরুষ ছিলেন!

সব পুরুষই খানিকটা অত্যাচারী। মিশ্রজীকে একা দোষ দিয়ে লাভ কি? মেয়েরা তা মেনে নিয়েই স্বামীর ঘর করে। আমার বিয়ে হয় আট বছর বয়সে, আর গাওনা হয় যখন আমার বয়স আঠারো। এই আট থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি আমাকে শেখানো হয়েছিল, কি করে স্বামীর মনোরঞ্জন করে চলতে হবে, রাগী-খেয়ালী বাইরের কাজে ব্যস্ত ভি আই পি স্বামীকে কি রকম করে তোয়াজ করতে হবে। তোমরা তো জানোই মিশ্রজী ছাত্রজীবনেই ভি আই পি হয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলন করে আর জেল খেটে, গান্ধীবাবার সঙ্গেও তাঁর কানেকশান ছিল।

আমরা মিশ্রজীর ব্যাকগ্রাইন্ড জানি মাতাজী।

মাতাজী! না, তুমি আমাকে মাতাজী বলে ডেকো না। অজিতের মতো তুমিও মা ডেকো। আজকাল অনেকে আমাকে গুরু বানিয়ে ফেলেছে, তাই মাতাজী ডাকটা চাউর হয়ে যাচ্ছে। পাঁচজনে ডাকুক, আমি তা ঠেকাতে পারব না। কিন্তু তোমরা ডেকো না।

মিশ্রজীর সঙ্গে আপনার কোথায় প্রফেশন্যাল জেলাসি ছিল কি? শুনেছি উনি জ্যোতিষট্যোতিস মানতেন না।

ওঁর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়েই নটখট ছিল। জ্যোতিষও তার মধ্যে একটা। তবে বাবা তোমাকে বলি জ্যোতিষ কিন্তু আমি টাকা রোজগারের জন্য করি না। আমার আগ্রহ ছিল, তাই প্রথম নিজে নিজে শিখেছিলাম। টের পেতাম, আমি অনেক অদেখা জিনিস অনুমান করতে পারি, অনেক অজানা কথা টের পাই। বিদ্যেটা আমি ভালবাসি। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করো না, না করাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার কাছে এটা লোক-ঠকানোর কায়দা নয়। অজিতকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, ও আমাকে অনেকটাই জানে।

জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি।

ভজনা দেবী যে একটু হাসলেন তা বোঝা গেল, ঘোমটার অন্ধকারেও তাঁর ঝকঝকে দাঁত ঝিকিয়ে ওঠায়, বললেন, বিশ্বাস করো ?

বিশ্বরূপ এ প্রশ্নটার জবাব দিল না ।

ভজনা দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পুলিশরা সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না । একজন পুলিশ অফিসারের তো এমনও সন্দেহ হয়েছিল যে, আমিই নাকি ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে মিশ্রজীকে খুন করিয়েছি । তার কারণ মিশ্রজীর দ্বিতীয় বিয়ে ।

কথাটা বলে ভজনা দেবী একটু আনমনা হয়ে বসে থেকে একটু ধরা গলায় বললেন, না হয় তাই হল, কিন্তু আমি কি পারি লালুয়া আর মহেন্দ্রকে খুন করতে ? লালুয়াকে যে এইটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছি । আমাকে গাল ভরে মা ডাকত ।

আমি মিশ্রজীর দ্বিতীয় বিয়েটা সম্পর্কে জানতে চাই । উনি বিয়েটা করলেন কেন ?

হয়তো ওটাও জীবন নিয়ে ওর রিসার্চ । তোমরা পুরুষমানুষেরা বাবা, এমনিতেই একটু নির্লজ্জ । বুড়ো বয়সেও কাম-কামনা সব দগদগ করে । আর তার জন্য না করতে পারো এমন কাজ নেই ।

কিছু যদি মনে না করেন, মিশ্রজী কি ওইরকমই ছিলেন ?

ভজনা দেবী আবার একটু চুপ করে থাকেন । তারপর ধীর গলায় বলেন, সেটা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে বাবা । মিশ্রজী গান্ধীবাবার শিষ্য । মেয়েছেলে নিয়ে ওঁর কোনও দুর্নাম কখনও ছিল না । কিন্তু এই বিয়েটা করেছিলেন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই ।

আপনি জেলাসি ফিল কেন করতেন না ?

আমার বয়স কত জানো ? আর ন মাস পর পাক্কা ষাট হবে । এ বয়সে আর জেলাসির কি থাকে বাবা ?

জেলাসির কি বয়স আছে ?

তুমি অনেক মানুষ ঘেঁটেছো, তোমাকে আর কি বোঝাবো বলো ! এই বয়সের যে জেলাসি তার রকম আলাদা ।

শুনেছি, আপনি মিশ্রজীকে ডিভোর্স দেননি !

ঠিকই শুনেছো । যদিও আমাদের সম্পর্ক আলগা হয়ে গিয়েছিল, তবু বিয়েটা আমি মানতুম । এখনও মানি । যদি কুসংস্কার বলতে চাও তো বোলো । আমাদের পরিবারের শিক্ষা অন্যরকম । আমরা, দেওঘরের

ঠাকুরজীর শিষ্য । ঠাকুরজী ডিভোর্স পছন্দ করতেন না । মিশ্রজী সেটা ভালই জানতেন । ঠাকুরজী যতদিন দেহে ছিলেন, মিশ্রজী তাঁর কাছে যেতেন । উনি দীক্ষা নেননি, কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল । মিশ্রজী জানতেন, আমি ডিভোর্সের মামলা মরে গেলেও করব না । কিন্তু উনি করলেন ।

আপনি মামলা লড়েননি ?

লড়ে কি হবে ? যেখানে আমিই ওঁর দুচোখের বিষ সেখানে আইনের লড়াই তো পণ্ডশ্রম । লোকে খোরপোষের কথা বলে । লোকেরা আহাম্মক । খোরপোষ নিতে যাবো কেন বলো তো ! আমি কি ভিখিরি ? মিশ্রজী অবশ্য দিতে চেয়েছিলেন, আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, নেবো না । তাতে ওঁর পৌরুষে লেগেছিল । উনি হয়তো ভেবেছিলেন, ভজনার আমার খোরপোষে বেঁচে থাকা মানেই ডিভোর্সের পরও একরকম বশ্যতা স্বীকার করা ।

জ্যোতিষ চর্চা থেকে আপনার আয় তাহলে ভালই হয় !

এখন হয় । আগে কষ্ট গেছে খুব ।

চাকর কফি দিয়ে গেল । সঙ্গে বিস্কুট ।

স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ভজনা বললেন, তুমি তদন্তে এসেছো বলে শক্ত হয়ে থেকো না । আমার ছেলেপুলে থাকলে হয়তো তোমার বয়সীই হত । ভাল ডালমুট আছে খাবে ?

না ।

আর সিগারেট খেতে চাইলে খেতে পারো । কিছু মনে করব না ।

কফির কাপটা তুলে নিয়ে বিশ্বরূপ বলে, মিশ্রজীর দ্বিতীয় স্ত্রী মিঠিয়া সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?

কিছুই জানি না । তাকে চোখেও দেখিনি । অজিতের কাছে শুনেছি সে নাকি দেহাতের মেয়ে । গরিবের মেয়েরা লোভে পড়েই তো এরকম বিয়ে করে ।

একটা গভীর শ্বাস ফেলে বিশ্বরূপ বলে, মিঠিয়া সম্পর্কে আমরা তেমন কোনও খবরই সংগ্রহ করতে পারছি না ।

কেন বাবা, তার গাঁয়ে খোঁজ করলেই তো হয় ।

অজিত এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল, একটিও কথা বলেনি । এবার হঠাৎ বলল, না মা, মিঠিয়ার কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না । কোথায় বাড়ি, কার মেয়ে কিছুই কেউ জানে না ।

ভজনা দেবী খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, অদ্ভুত কথা !

বিশ্বরূপ ধীর গলায় বলে, ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কোনও মানুষ তো নেই। রুট তো একটা থাকতেই হবে।

সে তো বটেই। তোমরা ভাল করে খুঁজেছো?

লোকাল পুলিশ খুঁজছে। পায়নি। কোনও অজ্ঞাতকুলশীলকে বিয়ে করার মতো অ্যাডভেঞ্চারাস মিশ্রজী ছিলেন কি?

ভজনা দেবী মাথা নেড়ে বললেন, ও মানুষ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। কখন যে কী করবেন তার কিছু ঠিক ছিল না। তবে অগাধ বুদ্ধিমান ছিলেন। আবার বোকার মতো কাজও করতেন।

বিশ্বরূপ আচমকা প্রশ্ন করে, বেশ কিছুদিন আগে আপনার বাড়িতে মিরচি নামের একটা মেয়ে কাজ করত কি?

ভজনা দেবী একটু অবাক হয়ে বললেন, মিরচি? ওঃ হ্যাঁ, মিরচি বলে একটা মেয়ে ছিল তো। কেন বাবা?

এমনিই। কি ভাবে সে ঢুকেছিল এ বাড়িতে তা মনে আছে?

ভজনা আবার ভাবিত হলেন, খুব সম্ভবত লালা রামবিলাসজী ওকে পাঠিয়েছিলেন।

মেয়েটা কেমন ছিল?

ওর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। খুব বেশি দিন ছিলও না আমার বাড়িতে। মেয়েটা ভাল ছিল না। আড়ি পেতে কথা শুনবার অভ্যাস ছিল। আমার মক্কেলরা যখন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করত তখন ও গিয়ে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করত। লালাজী পাঠিয়েছিলেন বলে প্রথমে তাড়াইনি। লালাজী মিশ্রজীর বন্ধু ছিলেন। আমাকে এখনও স্নেহ করেন। পাটনায় আমাকে সেটল হতে উনি অনেক সাহায্য করেছেন। ওঁর খাতিরে মিরচিকে কিছুদিন রেখেছিলাম। তারপর তাড়িয়ে দিই।

মেয়েটিকে মনে আছে?

আছে। দেহাতি মেয়ে। খুব ভাল স্বাস্থ্য। মুখখানাও খারাপ নয়। হঠাৎ মিরচির কথা কেন বাবা? তোমরা যারা পুলিশ তাদের আমি একটু ভয় পাই। এমন সব অদ্ভুত প্রসঙ্গ তোলো যে অস্বস্তিতে পড়তে হয়।

মিরচির ব্যাকগ্রাউন্ডও কিছু জানেন?

না। লালাজী হয়তো জানবেন।

লালাজী কবুল করেছেন যে, তিনিও জানেন না।

মিরচিকে নিয়ে এত কথা উঠছে কেন?

আমাদের যতদূর জানা আছে, মিরচিই মিঠিয়া ।

ভজনা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বলো কী ?

বিশ্বরূপ একটা ফটো বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলে, এ ছবিটা প্রেস ফটোগ্রাফারের তোলা । বিহারের অনেক কাগজে এ ছবি এবং আরও অনেক ছবি রসালো ক্যাপশন সহ ছাপা হয় । বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা । খবরের কাগজে এরকম ছবি আপনি দেখেননি ।

ভজনা কুণ্ঠিত হাতে ছবিটা তুলে নিয়ে অল্প আলোয় ঝুঁকে দেখলেন ।

চিনতে পারছেন ?

মিশ্রজীর পাশে এ তো মিরচিই মনে হচ্ছে ।

আপনার বাড়িতে খবরের কাগজ নিশ্চয়ই আসে ।

ভজনা মাথা নেড়ে বলেন, আমি খবরের কাগজ পড়ি না বাবা । রাখিও না । খুন জখম পলিটিকস আমার ভাল লাগে না । তবে নিউ পাটনা টাইমস পাই কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে ।

অজিত বলল, তাহলে আপনার দোষ নেই মা, নিউ পাটনা টাইমসের ছাপা এত খারাপ যে বাপের ছবি ছেলে চিনতে পারে না ।

ভজনা দেবী হাসলেন না । গম্ভীর গলায় বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় । কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই কিছু জানো বাবা । কিছু একটা আঁচ করেই কথাটা তুলেছো । তবে সত্যি কথাটা হল, মিরচিই যে পরে মিঠিয়া হয়েছে এটা আমার আজ অবধি জানা ছিল না ।

লোকাল পুলিশ কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করবে না ।

কেন বাবা ?

তাদের এমন সন্দেহ হতে পারে যে, মিরচিকে ষড়যন্ত্র করে আপনিই ভিড়িয়ে দিয়েছেন মিশ্রজীর সঙ্গে, যাতে মিশ্রজীর হাঁড়ির খবর আপনার নলেজে থাকে ।

ভজনা শান্ত কণ্ঠেই বলেন, এরকমও হয় নাকি ? শত্রু হলেও মিশ্রজী আমার স্বামী, আমি নিশ্চয়ই চাইব না তিনি আবার বিয়ে করে আমার অপমান করুন । তোমার মতও কি লোকাল পুলিশের মতোই ? তোমাকে দেখে যে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছিল ।

বিশ্বরূপ একটু হাসল, বুদ্ধিমান নই,তবে লজিক্যাল । আপনি যদি মিরচিকে মিশ্রজীর বাড়িতে প্ল্যান্ট না করে থাকেন তাহলে মিশ্রজীই তাকে প্ল্যান্ট করেছিলেন আপনার বাড়িতে ।

অবাক ভজনা বলেন, কেন বাবা, তা উনি কেন করবেন ?

আপনার হাঁড়ির খবর জানার জন্য । ইন ফ্যাক্ট লালাজীর কাছে উনিই মিরচিকে পাঠান যাতে লালাজী মিরচিকে আপনার বাড়িতে বহাল করতে সাহায্য করেন । কথাটা গোপন রাখতেও বলা হয়েছিল ।

তোমরা কি করে জানলে ?

লালাজী সবই কবুল করেছেন । তিনি নিরপরাধ ।

ভজনা দেবী অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন । তারপর বললেন, মিশ্রজী এতটা করতে গেলেন কেন ? আমার তো গোপন করার মতো কিছু নেই ।

হতে পারে, আউট অব জেলাসি । আপনার কাছে কার কার যাতায়াত সে বিষয়েও হয়তো কৌতূহল ছিল ।

তুমি কি বলতে চাও উনি আমাকে সন্দেহ করতেন ?

বিশ্বরূপ একটু চুপ করে থেকে বলে, সন্দেহ নানারকম আছে । উনি হয়তো আপনার নৈতিক চরিত্রে সন্দেহ করতেন না । কিন্তু পলিটিকসের লোকদের আরও নানা সন্দেহ থাকে । উনি হয়তো সন্দেহ করতেন যে, আপনি লোকের কাছে ওঁর কুৎসা রটান এবং ওঁর পলিটিক্যাল কেরিয়ারের ক্ষতি করার চেষ্টা করেন ।

সেটা তো অন্য কথা ।

সেটাই কথা । আপনিই অন্যরকম ভয় পাচ্ছেন ।

ভজনা দেবী একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে বললেন, বাঁচালে বাবা । মরার আগে যে অন্তত চরিত্রের দোষের কথা শুনে যেতে হচ্ছে না এটা মস্ত কথা । আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ।

দোষটা আমারই । কিছু মনে করবেন না । কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা রয়েই গেল । তা হল মিঠিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড ।

আমি জানলে তোমাকে সাহায্য করতাম ।

একটু মনে করে দেখবেন যে কখনও তার দেশ বা গ্রামের কথা আপনাকে বলেছিল কিনা । কথাচ্ছলেও তো মানুষ কত কথা বলে ।

ভজনা দেবী মাথা নাড়লেন, না বাবা, তার সঙ্গে ওসব কথা কিছু হয়নি । লালাজীর লোক বলে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেসও করিনি । তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মিরচি বা মিঠিয়াকে নিয়ে খুব চিন্তিত ।

হ্যাঁ । মিঠিয়াই হয়তো মিশ্রজীর নিয়তি । তাকে বিয়ে করার আগে অবধি মিশ্রজী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না । বিয়ের পর উনি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন । আপনি বোধহয় জানেন না যে, মিশ্রজী একটা এ কে ফর্টি

সেভেন রাইফেলও জোগাড় করেছিলেন ।

জানি বাবা, অজিত বলেছে । কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো বাবা, সন্ত্রাসবাদীরা মিঠিয়াকেও মেরেছে ।

ক্লান্ত স্বরে বিশ্বরূপ বলে, আমি কিছুই সহজে ভুলি না ।

তুমি খুব এফিসিয়েন্ট অফিসার, তাই না বাবা ?

হঠাৎ একথা কেন বলছেন ?

অন্য পুলিশদের মতো তুমি কাঠ-কাঠ নও, কড়া কথাও বলতে চাও না । সুরিন্দরের সঙ্গে পাল্লা নিতে তুমি একা এসেছো, তাতেই বুঝতে পারছি সরকার তোমার ওপর ভরসা করেন ।

মাথা নেড়ে বিশ্বরূপ বলে, কথাটা ঠিক নয় ।

অজিত তোমার কথা আগে কখনও বলেনি । তোমরা কি ছেলেবেলার বন্ধু ?

হ্যাঁ, বনগাঁর কাছে একটা গ্রামে আমরা থাকতাম । আমরা খুব গরিব ছিলাম । অজিতরাও ।

গাঁয়ে কে আছে ?

কেউ নেই । আমি বড় হয়ে কখনও সেখানে যাইনি ।

কেন যাওনি বাবা ?

অজিত হাসল, ও মনে করে গাঁয়ে গেলে ছেলেবেলার মুখগুলি সব হারিয়ে যাবে । ও ছেলেবেলাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ।

এ তো অদ্ভুত কথা !

মা, ও যে কত অদ্ভুত তা আপনি জানেন না । হার্ডকোর টেররিস্ট সুরিন্দর একসময়ে ওর দারুণ বন্ধু ছিল । জিগির দোস্ত । দুজনে এক টিমে হকি খেলত ।

বলো কী ? একটা খুনীর সঙ্গে !

তখন সুরিন্দর খুনী ছিল না, টেররিস্টও নয় । কাকার সঙ্গে ব্যবসা করতে কানাডা গেল । কিছুদিন বাদেই ফিরে এল টেররিস্ট হয়ে । বিশ্বরূপের আরও হিস্টরি আছে মা, তবে সেগুলো বলা যাবে না । ও রিটায়ার করার পরও যদি আমি বেঁচে থাকি তবে ওর ওপর একটা স্টোরি লিখব । তখন দেখবেন ।

বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়াল । তারপর বলল, সন্ত্রাসবাদীরা অনেক সময়ে নিজের লোককেও মারে, বিপদ বুঝলে । মিঠিয়ার মৃত্যুটা সেরকমই কিছু । তবে আমাদের ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা দরকার ।

হঠাৎ ভজনা দেবী মুখ তুলে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, সুরিন্দরকে পেলে তুমি কি করবে বাবা ?

বিশ্বরূপ চুপ করে রইল ।

মারবে তো ! অজিত আমাকে বলছিল, তাকে সরকারের চাই-ই, ডেড অর অ্যালাইভ । কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায় তাকে ধরা অসম্ভব । তাই না ?

বিশ্বরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এ প্রশ্নের কি জবাব হয় ?

ভজনা দেবী একটু ভেজা গলায় বলেন, সে তোমার বন্ধু ছিল, তোমাদের ভালবাসা ছিল । এটা খুব খারাপ সময় বাবা, এ যুগে ভালবাসা বড্ড তাড়াতাড়ি মরে যায় । তোমার হাতটা একটু আমাকে দেখাবে ?

বিশ্বরূপ অবাক হয়ে বলে হাত !

ভজনা দেবী হাসলেন, আমার কাছে যে কেউ যে-কোনও কাজেই আসুক, সকলেই একবার হাত বা কোষ্ঠী দেখিয়ে নিয়ে যায় । সত্যি হোক মিথ্যে হোক, সকলেরই নিজের ভবিষ্যৎ জানার কৌতূহল আছে । এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা । তুমি মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমের একজন । তোমার কোনও কৌতূহল নেই ?

বিশ্বরূপ একটু যেন লজ্জা পেয়ে বলে, ভবিষ্যৎ জানবার কিছু নেই আমার ।

এইটুকু বয়সেই তোমার মুখখানা ভারী মলিন আর হতাশ কেন বাবা ?

আমার মুখটাই ওরকম ।

তোমার হাতটা আমি দেখতে চাই । তোমার কৌতূহল না থাকতে পারে, অমার আছে ।

লাজুক একটু হাসি হেসে বিশ্বরূপ তার ডান হাতখানা কুণ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে দিল । ভজনা দেবী হাতের কাছেই একটা সুইচ টিপে একটা ছোটো স্পট লাইট জ্বাললেন । একখানা ভারী আতস কাঁচ দিয়ে হাতখানা দেখলেন মন দিয়ে । প্রথমে ডান, পরে বাঁ হাতও ।

দেহে মনে তুমি খুব শক্তিমান মানুষ ।

পুলিশে চাকরি করি বলে বলছেন ?

তা কেন ? তুমি যেরকম তোমার হাতও সেই রকমই বলবে ।

ভজনা দেবী আরও কিছুক্ষণ হাত দেখে চোখ বুজে একটু চুপ করে থাকলেন । তারপর ফের সেই অদ্ভুত প্রশ্নটা করলেন, তুমি সুরিন্দরকে মারবে ?

বিশ্বরূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত গলায় বলে, মারব না মরব তা তো জানি না । এ হল "জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত" । আমাদের শুধু চেষ্টা আছে । ফল জানি না ।

এ তো গীতার কথা । পড়েছো ?

পড়েছি ।

বার বার পোড়ো । তোমার যা জীবন, গীতা সবসময়ে তোমার পকেটে থাকা উচিত । দাঁড়াও আমার কাছে একটা ছোট্ট গীতা আছে তোমাকে দিই । দেবনাগরী তো পড়তেই পারো ।

হিন্দি আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষা । কিন্তু গীতার দরকার নেই ।

আছে । এই মায়ের এ কথাটা শুনো । সঙ্গে রেখো ।

বাইরের ঘরেই বুক শেলফ । ভজনা দেবী উঠে ছোট্টো একখানা পকেট গীতা এনে বিশ্বরূপের হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমাকে আমার উপহার ।

তাহলে আজ চলি । গীতাটা বুক পকেটে রেখে বিশ্বরূপ বলে ।

এসো বাবা, জয়ী হও ।

বিশ্বরূপ একটু হাসে, আমার জয়ী হওয়া মানে কিন্তু সুরিন্দরের মৃত্যু ।

ভজনা দেবী সামান্য শিহরিত হয়ে চোখ বুজলেন ।

চোখ বুজে থেকেই ভজনা দেবী গাঢ় স্বরে বললেন, কত মারবে তুমি ? মেরে মেরে কি শেষ করতে পারবে ওদের ? একজন মরছে তো দশ জন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ।

আপনি তো গীতা মানেন। যা ঘটবার তা ঘটেই আছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।

অস্ফুট কণ্ঠে ভজনা দেবী বললেন, ভুল হচ্ছে। কোথাও বড় ভুল হচ্ছে আমাদের ।

তাই হবে হয়তো । কে জানে ! দুর্বল পুরুষকার, দৈব বলবান ।

তারা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখনও নিথর হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন ভজনা দেবী ।

ফ্যাক্স মেশিনে মিঠিয়ার ছবি পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে । পরদিনই জবাব এল, নাম সুন্দরী । পদবী নেই । দেহাতি মেয়ে, তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত । ধানবাদে একটা ঠেক আছে । বন্দনা শর্মা হয়তো কিছু জানে । কিন্তু বন্দনা বড়লোকের মেয়ে, প্রভাবশালী । হ্যান্ডল উইথ এক্সট্রিম কেয়ার...

দুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় ধানবাদের এক অফিসার্স ক্লাবে একটি সুন্দরী মেয়ে বিলিয়ার্ড খেলছিল । আচমকাই টেবিলের ওপর একটা অচেনা ছায়া এসে পড়ল ।

হু আর ইউ ?

দি ল।

গো টু হেল ।

উই আর ইন হেল ম্যাডাম ।

বন্দনা নির্বাক মুখে বিষাদগ্রস্ত মুখখানার দিকে চেয়ে রইল । এত স্পর্ধা সে কারও দেখেনি । কিন্তু সে বুদ্ধিমতী । লোকটার পিছনে সে তিন চারজন লোককে দেখতে পেল, যাদের এখানে দেখার কথাই নয় । সে জানে, স্পর্ধার কাছে কখনও কখনও নত হতে হয় ।

বন্দনা মুখ নামিয়ে নিল ।

বিশ্বরূপ ইংরিজিতে বলল, আমি খুব বেশি সময় নেবো না । কিন্তু একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই ।

বন্দনা ঈষৎ রক্তাভ মুখে বলে, বাইরে আমার গাড়ি আছে ।

চলুন ।

ক্লাবের চমৎকার পার্কিং লটে একখানা নতুন মারুতি দাঁড়ানো । সবুজ রঙের ওপর ফ্লাড লাইট পিছলে যাচ্ছে । ভিতরে ঢুকে বন্দনা ইনজিন আর এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে দিল ।

নাউ শুট, হি ম্যান ।

বিশ্বরূপ তার ঘুম-ঘুম ঠাণ্ডা গলায় ইংরিজিতে বলে, আপনি যে কোনওরকম চেঁচামেচি রাগারাগি বা জোরজবরদস্তি না করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার সঙ্গে চলে এলেন তার জন্য ধন্যবাদ ।

মোটেই তা নয়, মিস্টার সুপারম্যান । আমি অতটা সহজ লোক নই । আপনার সঙ্গে চার পাঁচ জন প্লেন ড্রেস পুলিশ অফিসার ছিল, তাদের সবাইকে আমি চিনি । ডি এস পি চৌধুরী সাহেবকে আমি কাকা বলে ডাকি, উনি চোখ টিপে ইসারা করায় আমি রেজিস্ট করিনি । বুঝলেন, মিস্টার জিরো জিরো সেভেন ? এখন দয়া করে বলুন তো ক্লাবে এসে হামলা করার মতো এমন কী জরুরী ব্যাপার ।

বিশ্বরূপ ক্লান্ত গলায় বলে, ক্লাবে না এলে আপনাকে আজ ধরা যেত না । আজ রাতে আপনার বাড়িতে বিরাট পার্টি আছে ।

আপনি চালাক হলে সেই পার্টিতেই কৌশলে ঢুকে যেতে পারতেন । সীন ক্রিয়েট করতে হত না ।

আমি আজ রাতেই ধানবাদ ছেড়ে যাবো মিস শর্মা । আমার হাতে সময় ছিল না ।

একটা ফটোগ্রাফ বের করে বন্দনার হাতে দিয়ে বিশ্বরূপ বলে, দেখুন তো

একে চেনেন কিনা।

বন্দনা বাতিটা জ্বেলে এক পলক দেখেই বলল, সুন্দরী।

আমরা এর ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই।

সেটা আমি আপনাকে জানাবো কেন ? আমার কী দায় ?

সামনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আনমনে স্বগতোক্তির মতো মৃদু স্বরে বিশ্বরূপ বলে, আপনার কোনও দায় নেই মিস শর্মা।

বন্দনা শ্লেষ মেশানো গলায় বলে, নাউ মে আই গো ব্যাক টু মাই গেম, মিস্টার সেক্স অ্যাপিল ?

তেমনি আনমনে বিশ্বরূপ স্বগতোক্তির মতো করে বলে, গেম মিস শর্মা ?

চাপা তীব্র গলায় বন্দনা বলে, মিস্টার বিশ্বরূপ সেন, উইল ইউ প্লীজ গেট আউট অফ মাই হেয়ার নাউ ?

বিশ্বরূপ তার ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ দুখানা ধীরে ফেরাল বন্দনার মুখের ওপর, আপনি আমার নাম জানেন। জানার কথা নয় কিন্তু।

বন্দনা বিষ-হাসি হেসে বলে, আই হেট ইউ স্মার্ট আলেক। আই হেট ইওর গাটস।

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমন নির্বিকারভাবে বিশ্বরূপ বলে, উই কুড টক অ্যাবাউট গেমস। হোয়াট ইজ ইওর গেম মিস শর্মা ?

সেটা আমি আপনাকে বলব কেন ? আপনি আপনার খেলা খেলবেন, আমি আমার খেলা খেলব।

বন্দনার গলার ঝাঁঝ এবং তীব্র রাগ বা ঘেন্না স্পর্শও করল না বিশ্বরূপকে। আপনমনে মাথা নেড়ে সে বিড়বিড় করে বলল, ইট ওয়াজ নট সুরিন্দরস গেম আইদার। সুরিন্দর নেভার কিলড এ উওম্যান।

ঝাঁঝালো মার্কিন ইংরিজিতে বন্দনা বলে, কী সব যা তা বলছেন! প্লীজ! আমি আর সময় দিতে পারছি না।

বিশ্বরূপ একটু হাসে, সময়টা কাকে দেবেন মিস শর্মা ? যখন হাতে অনেক সময় পাবেন, কিন্তু বিলিয়ার্ড টেবল থাকবে না, ক্লাব থাকবে না, পার্টি থাকবে না, গাড়ি থাকবে না, বন্ধু থাকবে না, এমন কি এক চিলতে আকাশ বা সামান্য ঘাসজমিটুকুও থাকবে না, থাকবে শুধু গরাদের অবরোধ, তখন সময়টা কাকে দেবেন ?

বন্দনা চিড়চিড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

বিশ্বরূপ শান্ত গলায় বলে, অযথা আনপ্রফিটেবল রাগ করতে নেই। ইউ

আর নট বিয়িং লজিক্যাল ।

আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন ? অন হোয়াট গ্রাউন্ড ?

একথাটাও যেন শুনতে পেল না বিশ্বরূপ । বিড়বিড় করে বলে, কারও হাতে অঢেল সময়, কারও হাতে একটুও সময় নেই ।

কী বলছেন ?

আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট এ গেম মিস শর্মা । এ ডেডলি গেম । তাতে কেউ হারে না, কেউ জেতে না । শুধু লড়াই হয় ।

ননসেন্স ।

বিশ্বরূপ তেমনই বিড়বিড় করে, একদিন আমি আপনাকে আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাবো, যদি সময় আমাদের দয়া করে ।

আমি শুনতে চাই না ।

গাড়ি স্টার্ট দিন মিস শর্মা ।

কেন ?

উই আর গোয়িং ফর এ রাইড ।

হোয়াট রাইড ?

প্লীজ ! স্টার্ট দি কার । ড্রাইভ ।

বন্দনা গাড়িতে স্টার্ট দিল । ঝাঁঝালো স্টার্ট ।

আস্তে মিস শর্মা । উই আর নট গোয়িং টু কমিট সুইসাইড । আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ ।

হ্যাকনীড ।

মিস শর্মা, যে কোনও অন্ধকার নির্জন জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করান ।

কেন ?

আমি নেমে যাবো ।

তার মানে ?

আমার কাজ শেষ হয়েছে । আর কোনওদিনই আমাদের দেখা হবে না । গাড়িটা দাঁড় করান ।

বন্দনা স্তিমিত গলায় বলে, আর ইউ লিভিং ?

হ্যাঁ । ওই সামনে একটা গাছের ছায়া আছে । ওখানেই দাঁড় করান ।

বন্দনা গাড়ি দাঁড় করায় । বাঁ দিকের দরজাটা খুলতে হাত বাড়িয়েছিল বিশ্বরূপ ।

এক মিনিট মিস্টার সেন ।

বিশ্বরূপ ধীরে হাতটা তুলে নিজের কোলের ওপর ফিরিয়ে আনে । অস্ফুট গলায় বলে, বলুন ।

সুন্দরী আমাদের আয়া ছিল । তারপর সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দেয় । প্রথমে নকশাল ছিল । পরে অন্য কোনও ফ্যাকশনে জয়েন করেন । অ্যাকটিভিস্ট, হার্ডলাইনার । পীতাম্বর মিশ্রর সঙ্গে কি ভাবে যোগাযোগ হয় জানি না । তারপর খুন হয়ে যায় ।

আপনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের লিয়াজোঁ কে ছিল ? সুন্দরী ?

বন্দনার মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ে স্টিয়ারিং-এর ওপর । দুর্বল গলায় সে বলে, হ্যাঁ ।

সন্ত্রাসবাদ একটা রোমান্স, তাই না ? একটা বেটার সিস্টেম আনার স্বপ্ন দেখা । নকশালরাও দেখেছিল । দুনিয়ার সব সন্ত্রাসবাদীরাই স্বপ্ন দেখে ।

সময় আসবে স্মার্ট আলেক । সন্ত্রাস কেউ চায় না, তবু সন্ত্রাসের ভিতর দিয়েই পথ করতে হয় । যে জগদ্দল সিস্টেম আমাদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে তাকে ধাক্কা দেবো কি করে ?

বিশ্বরূপ বিড়বিড় করে, সবাই এ কথাই বলে, অল টেররিস্টস ।

আপনি সিস্টেমের প্রতিনিধি, আপনি বুঝবেন না ।

বিশ্বরূপ আনমনে চেয়ে থাকে সামনের দিকে । তারপর বিড়বিড় করে, আই হ্যাভ কাম এ লং ওয়ে টু কিল এ ম্যান ।

বন্দনা তীব্র চাপা গলায় বলে, হোয়াট ম্যান ?

যেন সামান্য সচকিত হয়ে বিশ্বরূপ বলে, আমারও সেই প্রশ্ন । হোয়াট ম্যান ।

বন্দনা সামান্য ঝুঁকে পড়ে তেমনই তীব্র গলায় বলে, এটা ইয়ার্কি নয় মিস্টার সেন । আমি জানতে চাই লোকটা কে । আপনি যাকে মারতে এসেছেন ?

ক্লান্ত চোখে চেয়ে বিশ্বরূপ তার ভাঙা ধীর গলায় বলে, কখনও হৃদয়বৃত্তিকে সন্ত্রাসের সঙ্গে মেশাতে নেই মিস শর্মা । সন্ত্রাসবাদীরা বরাবর ওই ভুল করে ।

কী বলছেন ?

বিশ্বরূপ মাথা নেড়ে তার স্বগতোক্তি করতে থাকে, একটা আনপড়, সরল দেহাতি মেয়েকে বিনা অপরাধে ওরকম ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া উচিত কাজ হয়নি ।

সুন্দরীকে কারা মেরেছে তা আমি জানি না ।

সুন্দরীর কথা হচ্ছে না ।

তবে কার কথা ?

সুন্দরীর বদলে যাকে মারা হয়েছিল ।

তার মানে ?

বিশ্বরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সুন্দরী মারা যায়নি মিস শর্মা । কিন্তু তার মৃত্যু দেখানোর জন্য একজন দেহাতি মেয়েকে তুলে আনা হয়েছিল পীতাম্বরের বাড়ির মধ্যে । তাকে মারা হয়েছিল এমন ভাবে যাতে চেনা না যায় । মেয়েটাকে মেরেছিল সুন্দরীই ।

বডি আইডেন্টিফাই করা হয়নি ?

কে আইডেন্টিফাই করবে ? কেউ তাকে ভাল করে দেখেনি । লোকাল লোকেরা তাকে চেনেও না । ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নিহত মেয়েটা মিঠিয়া অ্যালিয়াস মিরচি অ্যালিয়াস সুন্দরী ।

উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপছিল বন্দনার, সুন্দরী বেঁচে আছে ? আর ইউ সিওর ?

ভেরি মাচ ।

মাই গড ! বলে একদম নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল বন্দনা ।

বিশ্বরূপ তার স্বপ্নময় কণ্ঠে খুব ধীরে বলল, আপনার জীবনের আনন্দটাই মরে গেল বোধহয় । আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বেঁচে আছে, শুনে।

আই ডোন্ট বিলিভ ইউ ।

নো ম্যাটার, সুরিন্দর আর সুন্দরী বোধহয় এখন একসঙ্গে থাকে । কোথায় থাকে তা জানেন ?

কথাটার জবাব দিল না বন্দনা । চুপ করে বসে রইল । অনেকক্ষণ । তারপর একসময়ে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বিশ্বরূপের দিকে, আপনাকে এক ঘন্টা পর কোথায় পাওয়া যাবে ?

পাওয়া যাবে না মিস শর্মা ।

প্লীজ ! আমার জরুরী কথা আছে ।

বিশ্বরূপ ঘড়ি দেখল । তারপর বলল, রেস্ট হাউসের ফোন খুব আনসেফ । তবু নম্বরটা লিখে নিন ।

নোটবইতে নম্বরটা টুকে নিয়ে বন্দনা বলে, আপনি নিশ্চয়ই আর এক ঘন্টার মধ্যে ধানবাদ ছাড়বেন না ?

বোধহয় না । আমি নেমে যাচ্ছি মিস শর্মা । এক ঘন্টা—ঠিক এক ঘন্টা পর কথা হবে ।

বিশ্বরূপ নেমে দাঁড়াল । আড়মোড়া ভাঙল । তারপর ধীরে হাঁটতে শুরু

করল । অনেকক্ষণ অবধি বন্দনার গাড়ি স্টার্ট নিল না, টের পেল সে । তারপর স্টার্ট নিল । চলে গেল হু-হু করে ।

মৃতের মতো মুখ নিয়ে রেস্ট হাউসে ফিরে এল বিশ্বরূপ । যন্ত্রের মতো ঘর খুলল । দরজা বন্ধ করল । তারপর পোশাক ও জুতোসুদ্ধু বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল খানিকক্ষণ । ঘাসের ডাঁটি বেয়ে একটা পিঁপড়ে উঠছে । খামোখা । আবার নামছে । তাও অর্থহীন ।

এই বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্রে কার উত্থান, কার পতন তা কে বলবে । সে শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র । নিমিত্তের ভাগী । খড়ের পুতুল । কাজটুকু শুধু করে যাওয়া । ফললাভে তার অধিকার নেই । সে মেডেল পাবে না । যে দেশে সবাই চোর সে দেশে চোর ধরা পড়লে অন্য চোরেরা তাকে জোট বেঁধে পেটায় । চোরেরাই তাকে ধরে, তার বিচার করে চোরেরা, তাকে বন্দী করে পাহারা দেয় অন্য সব চোর । এর চেয়ে হাস্যকর সিস্টেম আর কী আছে ? চোরেরা আইন বানায়, চোরেরাই তা ভাঙে । বিশ্বরূপ এই সিস্টেমের দালাল, বেতনভুক খুনী । প্রতি সন্ধেবেলা তার দাদুর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের পাপের কথা বলতে ইচ্ছে করে ।

দাদু নেই । মা নেই । বাবা নেই । কেউ নেই । কেউ কোথাও নেই ।

ফোনের প্রথম রিং হতেই সতর্ক তন্দ্রা ভেঙে প্রস্তুত হাতে রিসিভার তুলে নিল বিশ্বরূপ ।

বন্দনা দূর গলায় বলল, মিস্টার সেন ?

হ্যাঁ ।

জিৎ হোটেল । রুম সতেরো ।

ধন্যবাদ । পার্টি কেমন চলছে ?

এখনও শুরু হয়নি । লেট নাইট পার্টি অফ ইয়ং পিপল । রাত ন'টায় শুরু হবে, চলবে সারা রাত । আসবেন ? আমি নেমন্তন্ন করছি আপনাকে । মিউজিক, ড্যানস, ড্রিঙ্কস, আসবেন ?

বিশ্বরূপ মৃদু হাসে, নেমন্তন্ন নিলাম, তবে যেতে পারব কিনা কে জানে. জীবন এত অনিশ্চিত ।

গড সেভ ইউ । অপেক্ষা করব কিন্তু ।

আচ্ছা । বাই ।

বাই ।

আর একটা অতি সংক্ষিপ্ত ফোন করল বিশ্বরূপ । একটু অপেক্ষা করল,

তারপর বেরোল ।

ফটকের সামনে দাঁড়াতেই একটা ধীরগতি পেটরল পুলিশ ভ্যান এসে তুলে নিল তাকে । ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে চোখ বুজে রইল বিশ্বরূপ । সে জানে, বন্দনা শর্মা তার সঙ্গে তঞ্চকতা করছে না, তার দেওয়া খবর একশ ভাগই ঠিক আছে । সুরিন্দর যদি তাকে একটু নাচিয়ে থাকে তবে সুরিন্দরের দোষ নেই । এই সব ফ্যানসি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে কি সুরিন্দরের চলে ? এরা তার কাজে লাগে, এদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় হয় । প্রয়োজনে এদের প্রভাব ব্যবহার করা যায়, অসময়ে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব হয়, এদের উচ্চকোটির বন্ধুবান্ধবদেরও কিছু সমর্থন মেলে, এই পর্যন্ত । বিশ্বস্ত, জান-কবুল সাথীয়া তো এরা নয় । তার জন্যই সুরিন্দরের লাগে সুন্দরীর মতো মেয়েদের, যারা যে-কোনও কষ্ট স্বীকার করতে পারবে, কখনও ছেড়ে যাবে না, কখনও অবাধ্যতা প্রকাশ করবে না, কেটে ফেললেও মুখ থেকে কোনও কথা কেউ যার বের করতে পারবে না । সুন্দরীর পরিচয়টা সেই জন্যই জানা দরকার ছিল বিশ্বরূপের । পীতাম্বর মিশ্র বুঝতেও পারেননি তিনি কোন আগুন নিয়ে খেলছেন। নিজের স্ত্রী ভজনা দেবীর ওপর প্রতিশোধ-স্পৃহায় তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । শেষ অবধি সুন্দরীর প্রভাবে হয়ে পড়েছিলেন উগ্রবাদের সমর্থক । হয়তো একটা সময়ে ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে চৈতন্যোদয় হয়েছিল তাঁর, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে । গুনাগার অনেক দিতে হল তাঁকে । ভজনা দেবী বলছিলেন, সায়নমতে পীতাম্বরের সূর্যরাশি হল বৃশ্চিক । বৃশ্চিকের জাতকেরা বুড়ো বয়সে হয় পাগল হয়ে যায়, নয়তো অপঘাতে মরে ।

বিশ্বরূপের সূর্য-রাশিও তাই । স্কোর্পিও বৃশ্চিক ।

স্টেশনের কাছেই জিৎ হোটেল, নতুন ঝকঝকে ঝলমলে । প্রায় দুশো গজ দূরে গাড়ি থেকে নামল বিশ্বরূপ । হাতে স্যুটকেস।

তার পায়ে পায়ে উচ্চারিত হচ্ছে একটি শ্লোক, হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম । তার বুক পকেটে ভজনা দেবীর দেওয়া গীতা । কিন্তু এ লড়াইতে কি হারজিৎ আছে ?

আই ওয়ান্ট এ রুম : রিসেপশন কাউন্টারে অকম্পিত হাতে রেখে একটু ঝুঁকে বলে বিশ্বরূপ । ঠাণ্ডা গলায় । বাঁ দিকে মস্ত রেস্তোরাঁ । অনেক লোক খাচ্ছে ।

ইয়েস স্যার । বলে বিনীত স্মার্ট সুবেশ অবাঙালি রিসেপশনিস্ট তার রুম চার্ট দেখতে দেখতে বলে, এ সি অর নন এ সি স্যার ?

নন এসি । ইটস অলরেডি কোল্ড ইন ধান্যবাদ ।

ইয়েস স্যার ।

একটু সময় লাগে । তারপর ঘরের চাবি হাতে আসে । হোটেল বয় তার স্যুটকেস তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে নিতে থাকে ।

ঘরে এসে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় সে । এই ফ্লোরেই কোণের দিকে সতেরো নম্বর ঘর । ঘরের আলো নিভিয়ে দেয় বিশ্বরূপ । একটু বসে থাকে চুপচাপ । হঠাৎ তার মনে পড়ল, সুরিন্দর তাকে ডাকত রূপা বলে । খেলার মাঠে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠত, আরে রূপা, গেন বাঢ়া রে !

এতক্ষণে নীচের রেস্তরাঁয় অন্তত ডজন খানেক সাদা পোশাকের পুলিশ ঢুকে পড়েছে খদ্দের হয়ে । তারা সশস্ত্র, প্রস্তুত । অন্ধকারেই ঘড়ি দেখল বিশ্বরূপ । একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে করিডোর দিয়ে ।

বিশ্বরূপ উঠে দরজা চুল-পরিমাণ ফাঁক করে দেখল । ঘর থেকে বেরোনোর আগে সুরিন্দরের লোক আগে দেখে নেবে, রাস্তা পরিষ্কার কিনা । এ সেই অগ্রদূত, লম্বা, ফিট, চটপটে ।

দরজাটা আর একটু ফাঁক করে দাঁড়ায় বিশ্বরূপ । লোকটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নেয় । তারপর নেমে যেতে থাকে ।

সতেরো নম্বরের দরজা ধীরে খুলে গেল । বুকটা হঠাৎ খাঁ খাঁ করে ওঠে বিশ্বরূপের । অতীত থেকে একটা কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল কি, রূপা, গেন বাঢ়া রে....

সুরিন্দর বেরিয়ে এল । ফেটে পড়ছে স্বাস্থ্য ! ফেটে পড়ছে আত্মবিশ্বাস । ফেটে পড়ছে অন্তর্নিহিত ক্রোধ ।

নিঃশব্দে দরজা খুলে মুখোমুখি করিডোরে দাঁড়াল বিশ্বরূপ ।

বিদ্যুৎ স্পর্শে কেঁপে গেল সুরিন্দর । তার ক্রূর চোখ স্থাপিত হল বিশ্বরূপের চোখে । কে জানে কেন হঠাৎ কোমল হয়ে এল সেই চোখ ।

করিডোরের বাতাসে একটা তরঙ্গ তুলে গভীর একটা কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, রূপা ।

॥ সাত ॥

জানালার ধারে তার প্রিয় সোফায় আজও সকালে খবরের কাগজ খুলে বসেছে শ্যামল, সেন্টার টেবিলে গরম চায়ের কাপ । ভোরের রোদ রোজকার মতো এসে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে । রান্নাঘর থেকে চিংড়ি রান্নার গন্ধ আসছে । তার সুন্দরী স্ত্রী একটু আগেই উঠে বাথরুমে গেছে । বাতাসে এখন চোরা শীত । চমৎকার আবহাওয়া । মাঝে মাঝে নিজেকে বেশ সুখীই লাগে শ্যামলের । মাঝে মাঝে মনে হয়, মোটা মাইনের চাকরি, নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, সুন্দরী স্ত্রী, ফুটফুটে বাচ্চা, তার অ্যাচিভমেন্ট বড় কম নয়, আবার মাঝে মাঝে এক একটা ভুতুড়ে দিন আসে যখন সব হিসেব ওলট পালট হয়ে যেতে চায় । তখন মনে হয়, তার মতো এমন অভাগা আর কে আছে ?

একটা খবরের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ল সে । গান ব্যাটল অ্যাট ধানবাদ । ড্রেডেড টেররিস্ট কিল্‌ড । সুরিন্দর নিহত হয়েছে ধানবাদের এক হোটেলে । তার তিন সঙ্গীর মধ্যে দুজন প্রাণ দিয়েছে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ।

খবরটা পড়ে একটু নিশ্চিন্ত শ্বাস ছাড়ে শ্যামল, যাক বাবা, সুরিন্দর যে কলকাতায় হাজির হতে পারেনি সেটাই বাঁচোয়া, ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক । বাজারে হাটে, রাস্তায় ঘাটে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ মারে । মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা কাউকে রেহাই দেয় না । ওদের হাতে থাকে সেই ভয়ংকর মারণাস্ত্র, যার নাম এ কে ফর্টি সেভেন । কী যে শুরু হয়েছে দেশটায় ।

আপন মনে মাথা নাড়ল শ্যামল । অফিসের সময় এগিয়ে আসছে । একটু অন্যমনস্ক ভাবে চা খেয়ে সে বাথরুমে গেল ।

খবরটা বকুল পড়ল আর একটু বেলায়, যখন শ্যামল অফিসে গেছে, মেয়ে গেছে পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে । একা জানালার ধারে বসে বকুল খবরটা পড়ে চুপ করে বসে রইল । বুকের মধ্যে একটু দোলা । শ্যামল বলেছিল, সুরিন্দরকে ধরতেই কলকাতায় এসেছিল বিশ্বরূপ । সেই থেকে সারাক্ষণ বকুলের বুকে কাঁটা দিয়ে ছিল একটা ভয় । ওই বিষণ্ণ, সুন্দর, শান্ত লোকটা কি পারবে এই লড়াইতে ?

বুক থেকে একটা বন্ধ বাতাসকে মোচন করল বকুল । জানালার বাইরে তাকিয়ে সে খুব আনমনা হয়ে গেল । এরকম কোনও বিপজ্জনক মানুষের সঙ্গে যদি বিয়ে হত তার, তাহলে কেমন জীবন হত বকুলের ? থ্রিলিং । কিন্তু না, সে জীবন সহ্য করতে পারত না বকুল । অত টেনশন তার হয়তো হার্টের অসুখ

তৈরি করত । তার চেয়ে এই-ই ভাল । এই সে বেশ আছে । জীবনটা একটু একঘেয়ে, কিছুটা আলুনি । তবু এ জীবনে তো কোনও টেনশন নেই । উদ্বেগ নেই । গান ব্যাটল অ্যাট ধানবাদ । ড্রেডেড টেররিস্ট কিলড । মাগো ! লোকটার ভয়ডর বলে কিছু নেই । একদিন মরবে ।

না, ওরকম পুরুষ চায় না বকুল । তবে মাঝে মাঝে বিশ্বরূপের কথা ভাবতে তার ভাল লাগবে । গায়ে কাঁটা দেবে আনন্দে, শিহরনে । সে চায় না বটে, কিন্তু পুরুষ মানুষ তো ওরকমই হওয়া উচিত । জঙ্গি পাইলট, আর্মি অফিসার, মাউন্টেনিয়ার, দুঃসাহসী গোয়েন্দা, রেসিং কারের ড্রাইভার ।

বিশ্বরূপ তার মনটা জুড়ে রইল আজ । যদি লানচে বা ডিনারে আসত ! যদি দেখা হত আবার । হবে কি ? না বোধহয় । পথের পরিচয় পথেই ফুরিয়ে যায় । এতক্ষণে বিশ্বরূপই কি তার কথা মনে রেখেছে ?

কলকাতায় একরকম সকাল, পাটনায় আর একরকম । আজ পাটনার আকাশ মেঘলা । ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে । তার মধ্যে ভজনা দেবী তাঁর ঘরখানা পর্দা টেনে আর একটু আঁধার করে নিয়েছেন ।

অজিত এল বেলা দশটা নাগাদ ।

মা, খবর শুনেছেন তো ?

বোস অজিত । সকালে পুলিশ সাহেব টেলিফোন করে জানিয়েছেন ।

আজ মিশ্রজীর আত্মা ঠাণ্ডা হল মা । তাঁর খুনী খতম হয়েছে ।

ভজনা দেবী ধ্যানস্থের মতো বসে ছিলেন, বললেন, তুই কি খুশি হয়েছিস ?

হয়েছি । মিশ্রজীর মতো মানুষকে ওরকম অপমান করেছিল বলে তার খতম হওয়ার খবরে খুশি হয়েছি । মিশ্রজী গান্ধীবাদী নেতা ছিলেন, ছাত্র আন্দোলন করেছেন, জেল খেটেছেন, মানুষের জন্য ত্যাগ ছিল অনেক । ওরকম একজন মানুষকে লোকটা অন্তত সাত দিন ধরে প্রায় চাকর বানিয়ে রেখেছিল । শুধু খুন করলে কিছু ছিল না, নেতারা খুন হতেই পারেন । কিন্তু হুকুমদাস বানিয়ে রাখবে কেন ?

ভজনা দেবী পাথরের মতো বসে রইলেন । তারপর বললেন, ঠাকুরের যা ইচ্ছা । আজ সকাল থেকে তাঁরই ধ্যান করছি । ঠাকুর বলতেন, মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপায় । বলতেন, ডেথ ইজ এ কিওরেবল ডিজিজ । মৃত্যুর বিরোধী ছিলেন খুব । কিন্তু আজ চারদিক থেকে কেন যে এত মরণ আমাকে ঘিরে ধরেছে !

একটা কথা আছে মা ।

কি কথা রে ?

মিঠিয়াকে নিয়ে ।

তাও জানি । পুলিশ সাহেব বলেছেন । মিঠিয়া মরেনি, ওরা মিঠিয়া সাজিয়ে আর একটা মেয়েকে মেরেছে ।

মিশ্রজীর সম্পত্তি এখনও অনেকটা আছে মা । কে দখল নেবে ?

উড়ে পুড়ে যাক ।

আমার সন্দেহ হয়, মিঠিয়া এসে ক্লেম করবে। পুলিশকে বলবে আতঙ্কবাদীরা ওকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল । বাকি ঘটনা ব্যাখ্যা করা সোজা ।

নিক বাবা, মিঠিয়াই নিক। মিশ্রজীকে পাপে ধরেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত হোক । আমাকে ওর কথা বল ।

কার কথা মা ?

ওই যে দুঃখী ছেলেটা, বিশ্বরূপ । ও তোর কেমন বন্ধু ?

ও একটা পাগল । বিশুর এখনও ধারণা, আমাদের গাঁ জগদীশপুরে আজও অন্ধকার রাতে হলধর ভূত আর জলধর ভূত লড়াই করতে আসে, আর জ্যোৎস্নারাতে খেলা করতে নামে পরীরা । ওর দাদু নাকি প্রতিদিন সন্ধেবেলা আজও দাওয়ায় বসে থাকেন । মা অপেক্ষা করেন, আরও কত কী ।

ওর কি কেউ নেই রে অজিত ?

না, পর পর মরে গেল সবাই । কত কষ্ট করে মানুষ হয়েছে ।

দুঃখী লোকেরা ভগবানের বড় আপন মানুষ হয়, জানিস তো !

বিশুর ভগবানও নাকি জগদীশপুরেই থাকেন। আর কোথাও নয়। জগদীশপুরে ।

ওর ভাল হোক বাবা । কোনও চোট পায়নি তো ! ভাল আছে ?

অজিত আনমনে বলে, চোট হয়নি। তবে কেমন আছে কে জানে মা। কোন এনকাউন্টারে কবে খরচ হয়ে যাবে । ওর কথা বেশি ভাববেন না । দুঃখ পাবেন ।

ওকে একখান গীতা দিয়েছিলাম । ওকে রোজ পড়তে বলিস ।

দিল্লিগামী ট্রেনের এক চেয়ার কারে আর একরকমের ভোর হল । বাইরে রোদে ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট । ধানক্ষেত, প্রান্তর, উচ্চাবচ ভূমি পিছনে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে রেলগাড়ি । একটি সিটে এলিয়ে পড়ে থাকা বিশ্বরূপের কাছে থেমে গেছে সব গতি । থেমে আছে সময় । হে কৃষ্ণ আমি কেন কিছুই বুঝতে

পারছি না কে আমার শত্রু, আর কেই বা আমার বন্ধু । হে কৃষ্ণ...হে কৃষ্ণ... কেন বুঝতে পারি না ? কেন পারি না, কৃষ্ণ....হে কৃষ্ণ...হে কৃষ্ণ....কেন ভোরবেলা আমার আঁধার নেমে আসে...কেন হারিয়ে যায় কাগজের নৌকো, পরী, ভূত....

ব্রেকফাস্ট সাব ?

ধীরে মুখখানা তোলে বিশ্বরূপ । ক্লান্তি আর ক্লান্তি ।...রূপা, গেন বাঢ়া রে...

ডবল ডিমের ওমলেট, টোস্ট, হট কফি...

আর ইউ সিক ?

বিশ্বরূপ মুখ ঘোরাল । চশমা পরা একজন ভদ্র মানুষ । বিশ্বরূপ মৃদু হেসে বলে, নো, থ্যাঙ্ক ইউ ।

ইউ লুক সিক । আই ক্যান হেলপ ইউ । আই অ্যাম এ ডক্টর ।

বিশ্বরূপ সোজা হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বসে, আই অ্যাম ও কে ডক্টর ।

ডাক্তারের ওপাশে জানালার ধারে এক ভদ্রমহিলা । একটু ঝুঁকে তিনি বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে বলেন, ইউ লুক ভেরি ডিজেক্টেড । টায়ার্ড পারহ্যাপস ?

এ বিট অফ দ্যাট । বাট ইট্স অলরাইট ।

একটু শীত করে বিশ্বরূপের ।

আই অ্যাম ডক্টর মণি, অ্যাণ্ড দিস ইজ মাই ওয়াইফ মুকুল । উই আর বোথ ডক্টরস । লেট মি ফিল ইওর পালস ।

বিশ্বরূপ হাতটা এগিয়ে দেয়

মাই গড । ইউ আর রানিং এ হাই টেম্পারেচার । হিয়ার আর টু ট্যাবেলটস । টেক দেম উইথ টি ।

বিনা প্রতিবাদে ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নিল বিশ্বরূপ । তারপর ঘুমোল কিছুক্ষণ ।

ইউ হ্যাভ এ মেলাঙ্কলিক ফেস ।

বিশ্বরূপ চোখ খোলে । মণি পাশে নেই । বোধহয় টয়লেটে । তার পাশে মুকুল ।

বিশ্বরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে । হে কৃষ্ণ, আমি কেন আর বুঝতে পারছি না কে শত্রু কে মিত্র । কেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব । কত দূর ছড়িয়ে দিয়েছো তোমার কুরুক্ষেত্র, কত দূর !

আপকা শুভ নাম ?

বিশ্বরূপ সেন ।

ইটস এ নাইস নেম । ইউ হ্যাভ এ নাইস ফেস ।

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ।

গো টু স্লিপ নাইস ম্যান । উই আর হিয়ার টু হেল্প ইউ ।

বিশ্বরূপ চোখ বোজে । একদিন গুপ্তঘাতক তাকে পেয়ে যাবে । বোমা বা অটোমেটিক রাইফেল বা চপার শেষ করে দেবে তাকে । তৈরি হচ্ছে তার আততায়ী । হে কৃষ্ণ, আমি কেন কিছুতেই আর বুঝতে পারি না কিছু । এই বিষাদ, এই প্রগাঢ় ক্লান্তির অর্থ, এই বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়ার অর্থ, গৃহ-বধূ-সন্তানের অর্থ, যশ ও উন্নতির অর্থ, আমি কিছুই আর বুঝতে পারি না কেন ? হে কৃষ্ণ...
